প্রাণীর বিষে ৩৮৬টি সম্ভাব্য অ্যান্টিবায়োটিক পৃ. ৩২

‘ক্যামেরায়’ ধরা পড়ল এক সৌরজগতের জন্ম! পৃ. ৫১

সোনালী মুরগিতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু! পৃ. ৬৯

বিজ্ঞানবার্তা

সংখ্যা ১, ইস্যু ৫

জুলাই ২০২৫

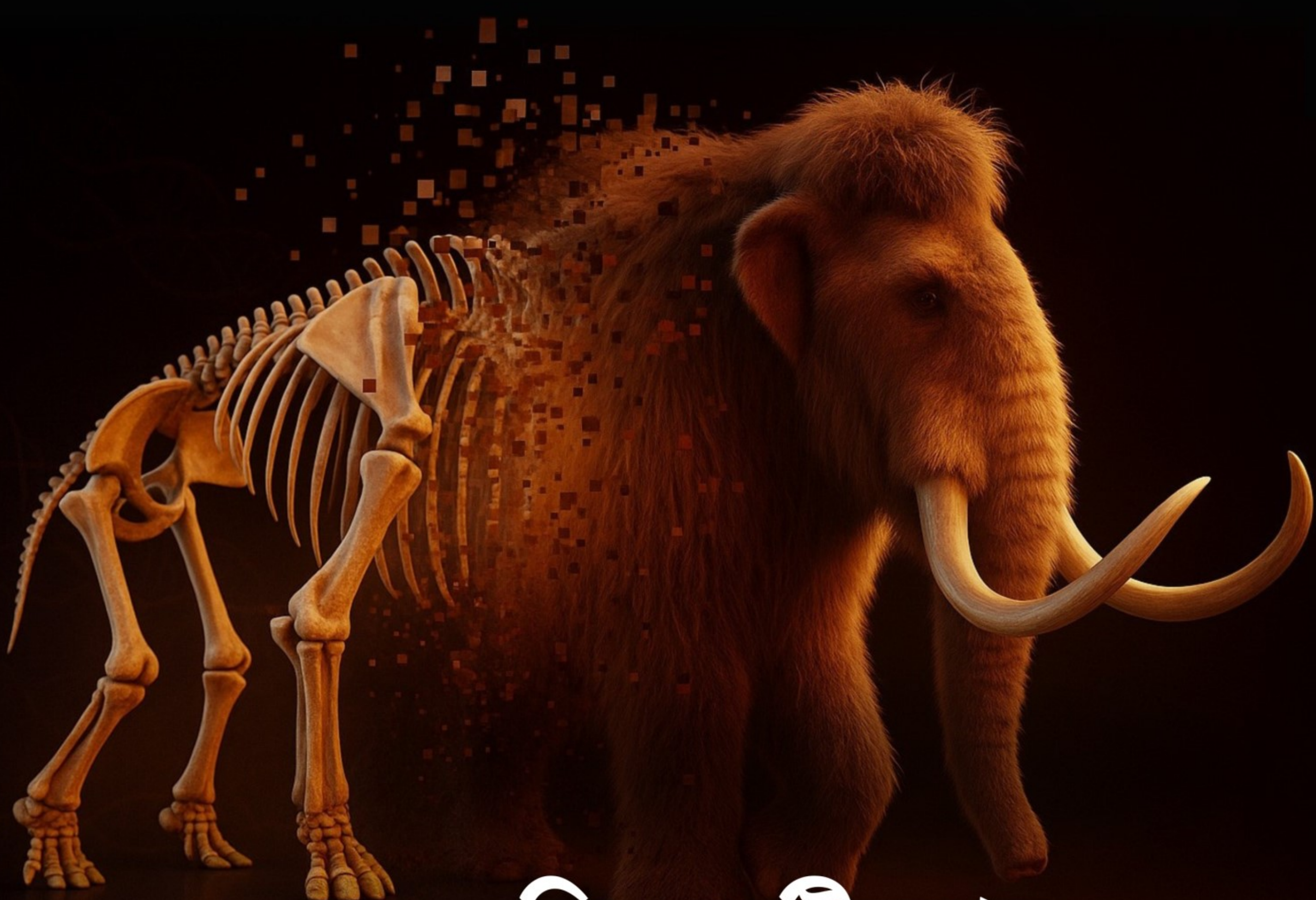

ডি-এক্সটিঙ্কশন

বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব?

পৃ. ৩৮

বিজ্ঞানবার্তা

জুলাই ২০২৫ • সংখ্যা ১ • ইস্যু ৫

সম্পাদক

তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক

সাদিয়া ইসলাম

প্রচ্ছদ

Kristina Armitage/Quanta Magazine/ChatGPT

প্রকাশক

বিজ্ঞানবার্তা (bigganbarta.org)

তারিখ: ২৫ আগস্ট, ২০২৫

ইমেইল: editor@bigganbarta.org

@bigganbarta

@bigganbarta

@bigganbarta

@bigganbartafb

info@bigganbarta.org

bigganbarta.org

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান এক অবিরাম যাত্রা। প্রতিদিনই পৃথিবী ও মহাবিশ্ব থেকে আমরা নতুন কিছু শিখি, নতুন রহস্য উন্মোচন করি। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো এটি কখনো থেমে থাকে না, বরং প্রতিটি প্রশ্ন থেকে জন্ম নেয় আরও হাজারো প্রশ্ন, প্রতিটি উত্তরের ভেতর লুকিয়ে থাকে আরও বিস্ময়।

এই সংখ্যায় আমরা পাঠকদের জন্য নিয়ে এসেছি সেই বিস্ময়ের কিছু অনন্য কাহিনি। মস্তিষ্কের একটি স্ক্যান থেকেই বয়সের গতি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে, যা ভবিষ্যতের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারে। ক্যান্সার কোষ কিভাবে স্নায়ু থেকে শক্তি চুরি করে বেড়ে ওঠে, তা আমাদের ক্যান্সার গবেষণার নতুন অধ্যায় খুলে দিচ্ছে। আবার মহাকাশে শনাক্ত হয়েছে তৃতীয় আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণকারী বস্তু, যা আমাদের সৌরজগতের বাইরের জগৎ সম্পর্কে আরও গভীর কৌতূহল জাগাচ্ছে। আর প্রাচীন মিশরের এক ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স আমাদের মানব ইতিহাসকে নতুন আলোয় দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

“বিজ্ঞানবার্তা” সবসময়ই চেষ্টা করে আসছে বিজ্ঞানকে সহজ, সাবলীল ভাষায় তুলে ধরতে যাতে পাঠক বিজ্ঞানের খোঁজখবর পান কেবল তথ্য হিসেবে নয়, বরং গল্পের মতো করে। আমরা বিশ্বাস করি, বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগারে আটকে থাকা জটিল সমীকরণ নয়; এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ, আমাদের চিন্তার অংশ।

তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে বিজ্ঞানের এই অভিযাত্রায় সঙ্গী হই, প্রশ্ন করি, খুঁজি, আর বিস্মিত হই।

— সম্পাদক

২৫ আগস্ট, ২০২৫

সূচীপত্র

লেপটন

জুলাই মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

০৫৫ প্লাস্টিকের বিকল্পে ব্যাকটেরিয়ার সেলুলোজ!

৫৭ বেটেলজিউস-এর 'সঙ্গী' নক্ষত্র

৬০ লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের জিন ও বয়সের প্রভাব

৬৪ লাতিন লেখার রহস্যভেদে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

৬৬ করোনাকালে মস্তিষ্ক দ্রুত বৃদ্ধ হয়েছে

৬৭ অ্যালুমিনিয়ামের নতুন আইসোটোপ আবিষ্কার

৬৮ পোড়া ক্ষতে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে

৬৯ সোনালী মুরগিতে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু!

৭০ চোখে দেখলেই প্রস্তুত হয় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

৭২ প্রকৃতিতে বজ্রপাতের সূত্রপাত কীভাবে হয়?

সংবাদ

০৪ একটি ব্রেইন স্ক্যানেই বয়সের গতি নির্ণয়!

০৫ ক্যান্সার কোষ স্নায়ু কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া চুরি করে

০৬ রহস্যময় ডাইনোসরের খোঁজ মিলল যুক্তরাষ্ট্রে

০৭ ঢাকার হাসপাতালের নর্দমায় বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া!

০৮ প্রাচীন মিশরের প্রথম মানব জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন

০৯ চিন্তা করতে পারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

১০ তৃতীয় আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু আবিষ্কার!

১৩ তিনটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙ আবিষ্কার

২১ বিরল ভাইরাস আবিষ্কারে বিড়াল

২২ ১১ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের 'কসমিক আউল'

২৪ নীল হাঙর নিজের রঙ পরিবর্তন করতে পারে!

২৫ ল্যাবে তৈরি ক্ষুদ্র অঙ্গ এখন নিজের রক্তনালীও গড়ছে

২৭ পুরোনো দাঁতের প্রোটিনে লুকানো ইতিহাস

২৮ বরফে ২৪ মিলিয়ন বছরের পুরনো দাঁতের প্রোটিন

৩২ প্রাণীর বিষে ৩৮৬টি সম্ভাব্য অ্যান্টিবায়োটিক

৩৩ ক্যান্সার চিকিৎসার বদলে দেবে ব্যাকটেরিয়া

৪৪ সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ

৪৫ ১৬৫ বছর পুরোনো তাপ বিকিরণ সূত্রের শেষ!

৪৬ অপিওয়েড শনাক্তকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন

৪৮ দেশ ভেদে বার্ধক্যের হার কেন ভিন্ন হয়?

৫১ 'ক্যামেরায়' ধরা পড়ল এক সৌরজগতের জন্ম!

৫২ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নিখুঁত ঘড়ি

৫৪ মস্তিষ্ক কীভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠে?

বিজ্ঞান ব্লগ

১৫ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ

১৭ কৃত্রিম রক্ত

৬১ মহাবিশ্বের শীতলতম স্থান

ফিচার

১৯ প্রায় সব জীব কেন অক্সিজেন গ্রহণ করে?

৩৮ বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা

মস্তিষ্ক

একটিমাত্র ব্রেইন স্ক্যানেই বয়সের গতি নির্ণয় সম্ভব!

বিজ্ঞানীরা নতুন এমন এক ব্রেন-ভিত্তিক অ্যালগরিদম তৈরি করেছেন যা দিয়ে একটি MRI স্ক্যান থেকেই কারো বার্ধক্যের গতি নির্ণয় করা সম্ভব। এটি ভবিষ্যতের রোগ, ডিমেনশিয়া, শারীরিক দুর্বলতা এমনকি মৃত্যুঝুঁকির পূর্বাভাস দিতেও সক্ষম।

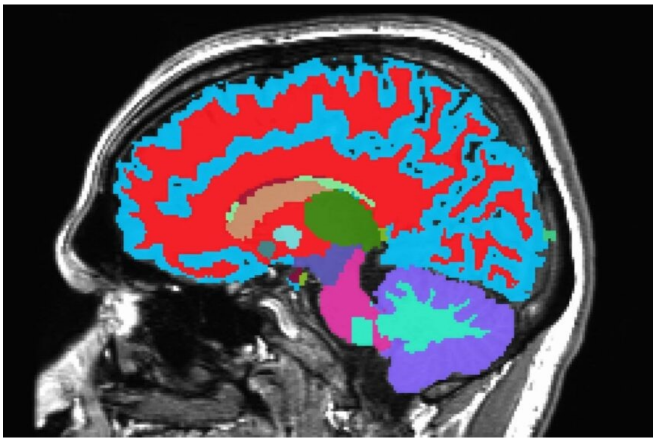

Ethan Whitman

বার্ধক্য মানেই বয়সের সংখ্যা নয়, বরং শরীর ও মস্তিষ্কের ক্রমাগত ক্ষয়—এখন বিজ্ঞান সেই ক্ষয়ের গতি পরিমাপ করার নতুন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। সম্প্রতি Nature Aging জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা DunedinPACNI নামক একটি অত্যাধুনিক অ্যালগরিদমের কথা জানিয়েছেন, যা মাত্র একটি ব্রেন MRI স্ক্যান থেকেই নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারে একজন মানুষের "aging speed" বা বয়স বাড়ার হার।

নিউজিল্যান্ডভিত্তিক বিখ্যাত Dunedin Study-এর তথ্য ব্যবহার করে তৈরি করা এই DunedinPACNI অ্যালগরিদম। এই অ্যালগরিদম মস্তিষ্কের গঠনগত ৯৯টি ভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে, এবং অনুমান করে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বয়সজনিত ক্ষয়ের গতি। গবেষণাটি দেখিয়েছে, যাদের DunedinPACNI স্কোর বেশি, তারা পরবর্তী জীবনে বেশি মাত্রায় স্মৃতিভ্রংশ, দুর্বল স্বাস্থ্যের সমস্যা, এবং এমনকি মৃত্যুর উচ্চতর ঝুঁকিতে থাকেন।

গবেষকরা ADNI, UK Biobank, এবং লাতিন আমেরিকার BrainLat ডেটাসেটেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখতে পান, এটি শুধু ব্রেন-সংশ্লিষ্ট রোগই নয়, বরং সামগ্রিক স্বাস্থ্য, দৈহিক কর্মক্ষমতা এবং সামাজিক অবস্থার প্রতিফলনও দেয়। অবাক করার মতোভাবে, যাদের আয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা কম, তাদের DunedinPACNI স্কোর তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা গেছে।

"একটি MRI স্ক্যান থেকেই কারো বার্ধক্যের গতি নির্ণয় করা সম্ভব অ্যালগরিদম দিয়ে"

DunedinPACNI আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে—সঠিক সময়ে (মধ্য বয়সে) একটি MRI স্ক্যান থেকেই ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যঝুঁকি আগেভাগেই চিহ্নিত করা সম্ভব। এটি ভবিষ্যতে এমন এক প্রযুক্তি হয়ে উঠতে পারে, যা বার্ধক্য রোধের চিকিৎসা বা হেলথ ইন্টারভেনশন মূল্যায়নের জন্য একটি কার্যকরী সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

তবে, এই প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতাও আছে। এটি মূলত ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এবং উচ্চ সামাজিক স্তরের মানুষদের তথ্য থেকে তৈরি, ফলে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীতে এর সাধারণীকরণ এখনো গবেষণার বিষয়। তবু DunedinPACNI আমাদের শেখাচ্ছে—বার্ধক্য শুধু সময়ের হিসাব নয়, বরং তা মস্তিষ্কে লেখা শরীরের অদৃশ্য আত্মজীবনী।

লেখক: নুজহাত সুবাহ ঐশী

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s43587-025-00897-z*

ক্যান্সার কোষ স্নায়ু কোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া চুরি করে

গবেষণায় দেখা গেছে, স্তন ক্যান্সার কোষ স্নায়ু থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া গ্রহণ করে নিজেদের শক্তি ও মেটাস্ট্যাসিস ক্ষমতা বাড়ায়। এই আবিষ্কার ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন পথ খুলে দিতে পারে।

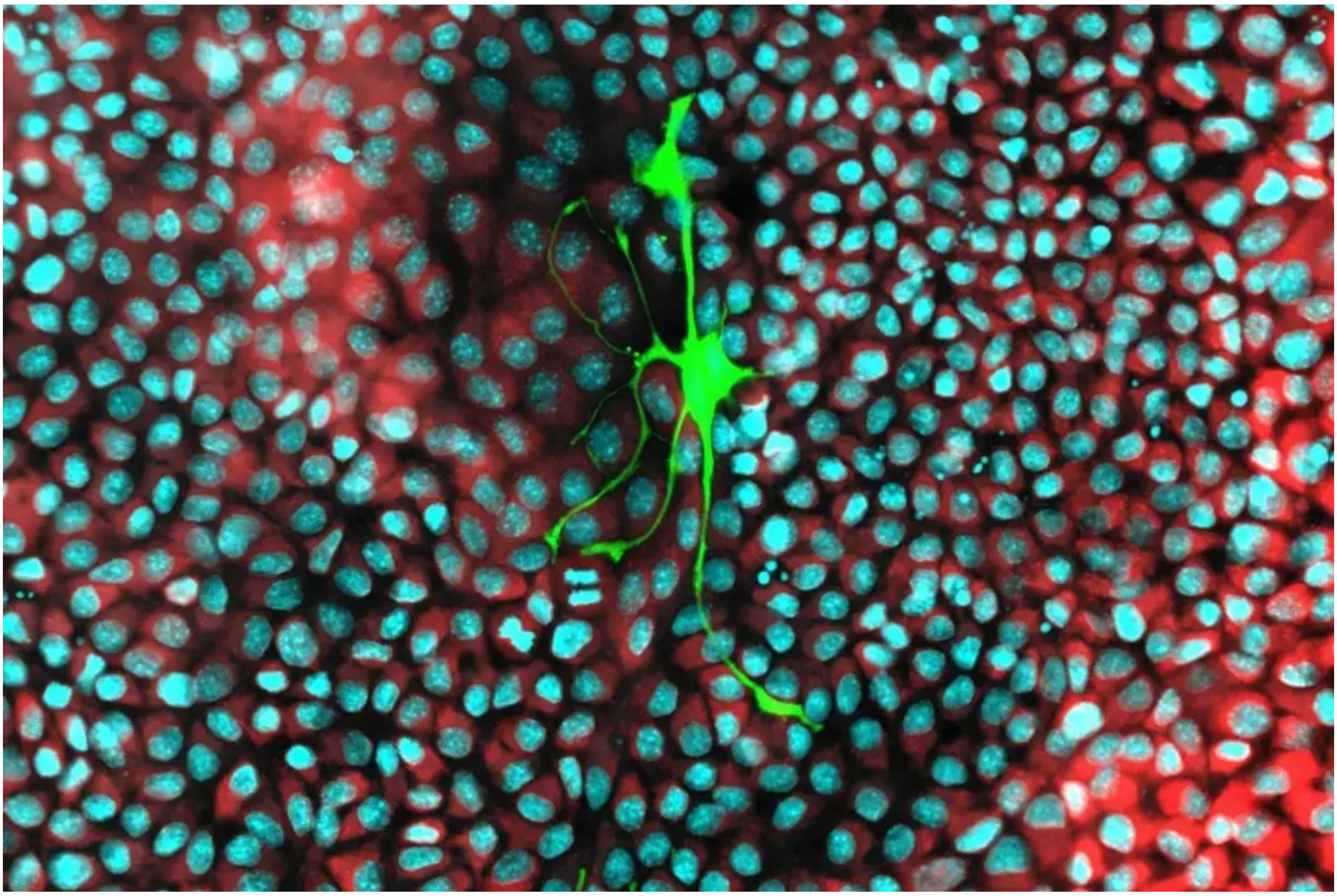

সবুজ রঙে চিহ্নিত ক্যান্সার কোষ কালচারে মধ্যে বেড়ে ওঠা একটি স্নায়ু কোষ (Simon Grelet & Gustavo Ayala)

দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানি, ক্যান্সার কোষেরা নিজেদের রূপ বদলাতে ও ছড়িয়ে পড়তে বেশ দক্ষ। তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য, ক্যান্সার কোষ নিজেদের শক্তি বাড়াতে আশ্রয় নিচ্ছে আমাদের স্নায়ুর! এই বিষয়ক গবেষণাটি গত ২৫ জুন, ২০২৫ *Nature*-এ প্রকাশিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, ক্যান্সার কোষ স্নায়ুকোষ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া (কোষের পাওয়ার হাউজ) চুরি করছে। গবেষণায় দেখা যায়, স্তন ক্যান্সারের কোষগুলো আশেপাশের স্নায়ুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেখান থেকে কার্যকরী মাইটোকন্ড্রিয়া নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এই প্রক্রিয়ার প্রমাণ মেলে MitoTRACER নামের এক অভিনব প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যেটি কোষে স্থানান্তর হওয়া মাইটোকন্ড্রিয়াগুলিকে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করতে পারে। গবেষকরা দেখতে পান, এই মাইটোকন্ড্রিয়া গ্রহণকারী ক্যান্সার কোষগুলো শুধু বেশি শক্তিশালীই নয়, বরং আরও বেশি প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম, এমনকি শরীরের দূরবর্তী অঙ্গেও সহজে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ মেটাস্ট্যাসিসের হার বাড়ে।

"ক্যান্সার কোষ স্নায়ুকোষ থেকে পাওয়ার হাউজ চুরি করে"

বিশেষত, পরীক্ষাগারে ও ইঁদুরের শরীরে দেখা যায়, যেসব ক্যান্সার কোষ স্নায়ুর মাইটোকন্ড্রিয়া পেয়েছে, সেগুলোর মস্তিষ্ক ও যকৃতে মেটাস্ট্যাসিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক

বেশি। এমনকি মানব স্তন ক্যান্সার রোগীর নমুনাতেও এ ধরণের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

গবেষণাটি আমাদের ক্যান্সার বোধে একটি বড় ধাক্কা দেয়। আগে ভাবা হতো, স্নায়ু ও ক্যান্সার আলাদা দুনিয়া। এখন বোঝা যাচ্ছে, স্নায়ু শুধু ক্যান্সার কোষের আশপাশে ঘোরাফেরা করে না, বরং তাদের সরাসরি শক্তি জোগায়! ক্যান্সার কোষ যেন স্নায়ুর কাছ থেকে ব্যাটারি ধার করে নিচ্ছে।

এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে ক্যান্সার থেরাপিতে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। যদি আমরা এই স্নায়ু-ক্যান্সার 'শক্তির লেনদেন' বন্ধ করতে পারি, তবে হয়তো মেটাস্ট্যাসিস ঠেকানো সম্ভব হবে।

লেখক: সুলতানা লাবিবা
রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09176-8*

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

রহস্যময় ডাইনোসরের খোঁজ মিলল যুক্তরাষ্ট্রে

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে জুরাসিক যুগের এক নতুন ছোট আকারের ডাইনোসর Enigmacursor mollyborthwickae-এর সন্ধান মিলেছে। এটি ছিল দুই পায়ে চলা ছোট উদ্ভিদভোজী প্রজাতি, যা আগে পরিচিত ন্যানোসরাস থেকে ভিন্ন। এই আবিষ্কার ছোটখাটো ডাইনোসরদের বৈচিত্র্য নিয়ে নতুন ধারণা দিচ্ছে।

Bob Nicholls

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের মরিসন ফর্মেশন থেকে এক অসাধারণ নতুন গণ এবং প্রজাতির ডাইনোসরের সন্ধান পেয়েছেন জীবাশ্মবিদরা। এই নতুন ডাইনোসরের নাম রাখা হয়েছে *Enigmacursor mollyborthwickae*। এটি ছিল একটি ছোটখাটো কুকুরের সমান উদ্ভিদভোজী ডাইনোসর, যার জীবাশ্ম ত্রি-মাত্রিক অবস্থায় ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল।

এই ডাইনোসরটি বসবাস করত জুরাসিক যুগের শেষভাগে, আনুমানিক ১৫০ থেকে ১৪৫ মিলিয়ন বছর আগে। এটি ছিল দুই পায়ে চলাচলকারী একটি উদ্ভিদভোজী প্রজাতি। উচ্চতায় মাত্র ০.৫ মিটার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিটার। সে সময়কার

ডিপ্লোডোকাস বা স্টেগোসরাসের মতো বিশালাকৃতির ডাইনোসরের ছায়ায় কলোরাডোর বন্যপ্রান্তরে এরা ঘোরাঘুরি করত।

ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, লন্ডনের জীবাশ্মবিদ সুজান্না মেইডমেন্ট ও পল ব্যারেট জানিয়েছেন, কঙ্কালের কিছু অংশ এখনো পুরোপুরি জোড়া লাগেনি — বিশেষ করে কশেরুকার উপরের অংশ, যা সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচের অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এর মানে সম্ভবত এই এনিগমাকার্সর এখনও পুরোপুরি বড় হয়ে ওঠেনি, অর্থাৎ এটি একটি ইয়াং ডাইনোসর ছিল।

এই জীবাশ্মটি ২০২১ এবং ২০২২ সালে মরিসন ফর্মেশনের একটি বাণিজ্যিক খনিতে খননের মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে, এটি একটি ন্যানোসরাস (*Nanosaurus*) ডাইনোসর বলে মনে করা হয়েছিল যার নামকরণ হয়েছিল ১৮৭০-এর দশকে। কিন্তু পরে বিশ্লেষণে দেখা যায়, ন্যানোসরাসের আগের জীবাশ্মগুলো এতটাই খারাপ অবস্থায় ছিল যে তা সঠিকভাবে পরিচিতির জন্য উপযুক্ত নয়।

নতুন এই জীবাশ্মটি অনেক ভালো সংরক্ষিত ছিল এবং এতে এমন অনেক ভিন্নতা ছিল, যা এটিকে একটি সম্পূর্ণ নতুন গণ ও প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে।

গবেষকদের মতে, "*Enigmacursor mollyborthwickae* ডাইনোসরদের স্পেকট্রামে নতুন বৈচিত্র্য যোগ করেছে এবং মরিসন ফর্মেশনের ডাইনোসরদের শারীরবৃত্তীয় গঠনের ব্যাপারে নতুন তথ্য দিয়েছে। এটি আরও প্রমাণ করে, মরিসন অঞ্চলে ছোটখাটো দেহের অরনিথিসকিয়ান ডাইনোসরের বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি, যা আগে বোঝা যায়নি।"

এই আবিষ্কার প্রমাণ করে, জুরাসিক যুগে শুধুমাত্র বিশালাকৃতির ডাইনোসরই রাজত্ব করত না, বরং তাদের পাশে ঘোরাফেরা করত ছোট, চটপটে, রহস্যময় ডাইনোসরের দল, যাদের সম্পর্কে আমরা এখন ধীরে ধীরে জানতে পারছি।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: 10.1098/rsos.242195*

বাংলাদেশ

ঢাকার হাসপাতালের নর্দমায় বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া!

ঢাকার একটি হাসপাতালের নর্দমা থেকে সংগ্রহ করা Bacillus cereus (MBC) ব্যাকটেরিয়ার জিন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এটি বহু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ও রোগ সৃষ্টিকারী বিষাক্ত জিন বহন করে। গবেষণাটি হাসপাতালে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক ও অপরিশোধিত বর্জ্যের কারণে প্রাণঘাতী জীবাণুর উদ্ভবের বিপদকে সামনে তুলে ধরেছে।

ঢাকার একটি হাসপাতালের নর্দমা থেকে আলাদা করা হলো একটি বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া—*Bacillus cereus*, যার জিনগত বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে ভয়াবহ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও রোগসৃষ্টির শক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল এই ব্যাকটেরিয়ার পুরো জিনোম বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে এটি বহুধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী এবং রোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক বিষাক্ত জিন বহন করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যাকটেরিয়াটির জিনোমে ৫,৮৮১টি প্রোটিন-কোডিং জিন রয়েছে, যার মধ্যে ২৮টি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন শনাক্ত করা গেছে। বিশেষ করে, BcI, BcII ও BcIII নামক তিনটি বিটা-ল্যাকটামেজ জিন, tetB(P) (টেট্রাসাইক্লিন প্রতিরোধ), vanY (গ্লাইকোপেপটাইড প্রতিরোধ), এবং fosB (ফসফোমাইসিন প্রতিরোধ) এই ব্যাকটেরিয়াকে বহু প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের বিপক্ষে অদম্য করে তুলেছে। যা একটি বিপজ্জনক সংকেত।

এছাড়া, এটি হেমোলাইসিন BL (HBL), নন-হেমোলাইটিক এন্টারোটক্সিন (NHE) এবং সাইটোটক্সিন K (CytK) নামক তিনটি শক্তিশালী টক্সিন তৈরি করতে পারে, যা ডায়রিয়া, বমি এবং এমনকি নেক্রোটিক ইনফেকশন ঘটাতে পারে।

গবেষকরা বলেন, হাসপাতালের নর্দমা বহুমাত্রিক জীবাণুর আধার, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি ও অন্যান্য রাসায়নিক পরিবেশে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন ঘটে। *Bacillus cereus* তেমনি এক উদাহরণ, যেটি কঠিন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য শক্তিশালী বায়োফিল্ম

তৈরি করতে পারে এবং এর জিনে বহন করে রোগ সৃষ্টির ও প্রতিরোধের নানা অস্ত্র।

Kateryna Kon/Shutterstock

এই গবেষণাটি একদিকে যেমন বাংলাদেশের হাসপাতালবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে অনিয়মের প্রতিফলন, তেমনি বিশ্বব্যাপী অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR)-এর বিপদকেও সামনে তুলে ধরেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া অপর্যাপ্তভাবে পরিশোধিত বর্জ্যজলের মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তা কৃষি, নদী, এমনকি মানুষের খাদ্য চেইনেও ঢুকে যেতে পারে।

Bacillus cereus এর এই পূর্ণাঙ্গ জিনগত বিশ্লেষণ শুধু একটি ব্যাকটেরিয়ার গল্প নয়; এটি এক ভয়াবহ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি—যেখানে হাসপাতালে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক ও পরিচ্ছন্নতাহীনতার ফলে তৈরি হচ্ছে এমন জীবাণু, যেগুলো ভবিষ্যতের জন্য চরম হুমকি হয়ে উঠতে পারে। তাই এখনই দরকার শক্তিশালী জিনোমিক নজরদারি ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা—জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে।

লেখক: নাওরিন জামান নিম্মি

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41598-025-06655-w

জেনেটিক্স

প্রাচীন মিশরের প্রথম মানব জিনোম সিকোয়েন্স সম্পন্ন

প্রথমবারের মতো প্রাচীন মিশরের (খ্রিস্টপূর্ব ৪,৮০০ বছর) এক ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, তার পূর্বপুরুষদের উৎস ছিল মূলত উত্তর আফ্রিকা ও আংশিকভাবে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল, যা প্রাচীনকালে মানুষ ও সংস্কৃতির আন্তঃসংযোগের প্রমাণ দেয়।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো প্রাচীন মিশরের একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ব্যক্তি প্রায় ৪,৮০০ থেকে ৪,৫০০ বছর আগে বেঁচে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে যখন মিশরের প্রাচীন পিরামিডগুলো নির্মাণ শুরু হচ্ছিল। গবেষণাটি গত ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে *Nature* জার্নালে প্রকাশিত হয়।

এই আবিষ্কারে ব্যবহৃত নমুনাটি এসেছে দক্ষিণ কায়রোর ২৬৫ কিলোমিটার দূরে নুয়াইরাত (Nuwayrat) নামক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে পাওয়া দাঁত থেকে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ব্যক্তির জিনগত গঠন প্রধানত উত্তর আফ্রিকার নওলিথিক কৃষিজীবীদের মতো, তবে তার প্রায় ২০% পূর্ব ফার্টাইল ক্রিসেন্ট (Mesopotamia সহ) অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। এটি প্রমাণ করে, শুধু সাংস্কৃতিক বা বাণিজ্যিক নয়, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে আদান-প্রদান ছিল জৈব-মানবিকও।

অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই প্রাচীন মানুষটি মমি করা ছিল না, বরং একটি মাটির পাত্রে সমাহিত ছিলেন। এই পদ্ধতিই হয়তো তার ডিএনএ সংরক্ষণে সহায়ক হয়েছে। গবেষণায় আরও জানা গেছে, তিনি একজন পুরুষ, বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি, এবং আজীবন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতেন, সম্ভবত একজন মৃৎশিল্পী ছিলেন।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীন মিশরীয় ডিএনএ নমুনাগুলোর বেশিরভাগই আংশিক বা আধুনিক ডিএনএ দ্বারা দূষিত ছিল। এমনকি ১৯৮৫ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্ভান্তে প্যাবো যে শিশুমমির ডিএনএ পরীক্ষা করেছিলেন, তাও পরবর্তীতে আধুনিক ডিএনএ দ্বারা সংক্রমিত বলে ধরা পড়ে। তাই এই পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স একটি যুগান্তকারী সাফল্য।

যে চিনামাটির পাত্রে ব্যক্তিটির দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল (A. Morez et al./Nature)

গবেষণাটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, পূর্ববর্তী নওলিথিক যুগে মিশর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মানুষের স্থানান্তর ও মিশ্রণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রভাব ছাড়িয়ে বংশগতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়াও, দাঁতের আইসোটোপ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তিনি নীলনদের আশেপাশে জন্মেছিলেন এবং গম, যব ও প্রাণিজ আমিষভিত্তিক খাদ্যগ্রহণ করতেন যা তৎকালীন মিশরের মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।

যদিও এটি একটি মাত্র ব্যক্তির নমুনা, তবুও এটি প্রাচীন মিশরীয় জনগোষ্ঠীর গঠনের ইতিহাসে এক নতুন জানালার উন্মোচন করে। আরও বেশি সংখ্যক নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রাচীন মিশরের মানব ইতিহাস আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে বলে আশা করছেন গবেষকেরা।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09195-5*

প্রযুক্তি

মানুষের মতো চিন্তা করতে পারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সেন্টোর নামে একটি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমান ল্যাঙ্গুয়েজ-মডেল মানুষের চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন বোঝার একটি যুগান্তকারী পথ খুলে দিয়েছে। বৃহৎ মনোবিজ্ঞান তথ্যের উপর ট্রেইন করা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো আচরণ ভবিষ্যদ্বাণী এবং ব্যাখ্যা করতে পারে, এমনকি এর কার্যক্রম মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকলাপের সাথেও মিল আছে।

মানব মনের জটিল কার্যপ্রণালী বুঝতে বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা একটি সমন্বিত তত্ত্ব বা মডেলের স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবের দিকে এক বিশাল পদক্ষেপ এগিয়ে নিয়ে এসেছে একটি নতুন মডেল Centaur (সেন্টোর)।

গত ২ জুলাই, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা এমন এক শক্তিশালী কম্পিউটেশনাল মডেল তৈরির কথা বর্ণনা করেন, যা বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় মানুষের আচরণ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তাও আবার শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ভাষায় প্রকাশযোগ্য তথ্য ব্যবহার করেই। এই মডেলটিকে ট্রেইন করা হয়েছে Psych-101 নামক একটি বিশাল ডেটাসেটের উপর, যেখানে ৬০,০০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর ১৬০টি ভিন্ন পরীক্ষার প্রায় ১ কোটিরও বেশি সিদ্ধান্ত রেকর্ড করা হয়েছে।

Centaur মূলত মেটা-র তৈরি Llama 3.1 নামের একটি এলএলএম (large language model)-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে যুক্ত করা হয়েছে low-rank adapter প্রযুক্তি, যা খুবই সামান্য পরিমাণ নতুন প্যারামিটার ব্যবহার করেই বিশাল মডেলটিকে মানুষের মতো আচরণ শেখাতে পারে। মডেলটি ৫ দিন ধরে একটি A100 GPU-তে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, Centaur সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্তগুলো খুব নির্ভুলভাবে অনুমান করতে পারে। নতুন বা পূর্বে দেখা না-পাওয়া পরীক্ষা, কাঠামো ও কভার স্টোরিতেও সফলভাবে জেনারেলাইজ করতে পারে। তার অভ্যন্তরীণ রিপ্রেজেন্টেশন মানুষের নিউরাল এক্টিভিটির (fMRI) এর সাথেও বেশি মিলে।

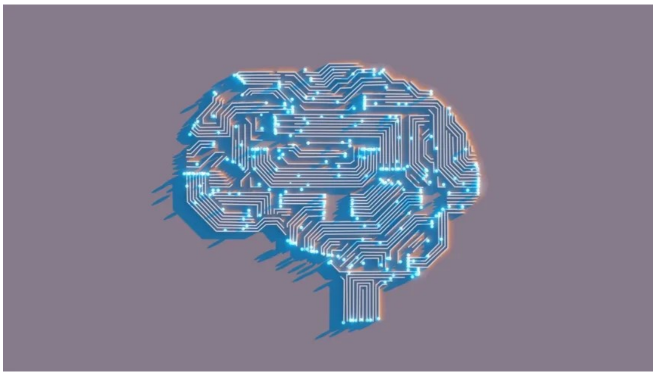

Boris SV/Getty Images

সেন্টোর কেবল গড়পড়তা আচরণ নয়, বরং মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বিচিত্র সিদ্ধান্তের ধরণগুলোও তুলে ধরে। এটি এমনকি সেইসব কাজেও ব্যর্থ হয় যেখানে মানুষ নয় বরং যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার ধরন বোঝা দরকার — যা প্রমাণ করে, মডেলটি সত্যিই মানুষের চিন্তাভাবনার একটি সন্নিকটে ছায়াপ্রতিচ্ছবি তৈরি করতে সক্ষম।

এই গবেষণার অন্যতম দিক হলো, সেন্টোর শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করেই থেমে থাকে না; এটি বিজ্ঞানীদেরকে মানব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাখ্যা ও নতুন তত্ত্ব তৈরিতে সাহায্য করে। এক উদাহরণে, DeepSeek-R1 নামে অপর একটি মডেলকে Psych-101 ডেটা ব্যাখ্যা করতে বলা হলে, এটি এমন এক কৌশল বের করে, যা পূর্বে বিবেচিত হয়নি, এবং তা থেকে তৈরি মডেল মানুষের আচরণের ব্যাখ্যায় আগের যেকোনো মডেলের চেয়ে ভালো করে। এরপরে Centaur-এর সহায়তায় সেই মডেলকে আরও নিখুঁত ও ব্যাখ্যাযোগ্য রূপে পরিণত করা যায়।

Centaur মানুষের চিন্তা-চেতনা ধরার পথে এক নতুন যুগের সূচনা। এটি শুধু মনস্তত্ত্ব নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিউরোসায়েন্সের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে— আমরা এখন এমন একটি সময়ে পৌঁছেছি, যেখানে মেশিনের মাধ্যমে মানবমনের গভীরে প্রবেশ করার দরজা খুলে গেছে। তবে এই যাত্রা তো কেবল শুরু।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09215-4*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

তৃতীয় আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু আবিষ্কার!

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সদ্য আমাদের সৌরজগতে তৃতীয় আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু 3I/ATLAS শনাক্ত করেছেন, যা ঘণ্টায় ২,৪৫,০০০ কিমি গতিতে ছুটে আসছে। এটি আলফা সেন্টোরির মতো প্রতিবেশী স্টার সিস্টেম থেকে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতে তৃতীয় পরিচিত আন্তঃনাক্ষত্রিক (interstellar) আগন্তুক বস্তু শনাক্ত করেছেন। গত ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অ্যাস্টেরয়েড টেরেস্ট্রিয়াল-ইমপ্যাক্ট লাস্ট অ্যালার্ট সিস্টেম (ATLAS) প্রথম এই মহাজাগতিক অতিথিকে শনাক্ত করে, এবং তখন এটিকে সাময়িকভাবে "A11pl3Z" নামে ডাকা হচ্ছিল। নাসার সেন্টার ফর নিয়ার আর্থ অবজেক্ট স্টাডিজ এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিয়ন (IAU) এই আবিষ্কারটি নিশ্চিত করেছে, এবং এখন বস্তুটির অফিসিয়াল নামকরণ হয়েছে: 3I/ATLAS।

3I/ATLAS যে আমাদের সৌরজগতের বাইরের উৎস থেকে এসেছে, তা নির্দেশ করার মতো কিছু শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রথমত, এটি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলেছে। বর্তমান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এটি ঘণ্টায় প্রায় ২,৪৫,০০০ কিলোমিটার গতিতে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে — এই গতি সূর্যের মহাকর্ষ টান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

যে কোনো বস্তু যদি পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি থাকে, তাহলে সৌরজগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে তার প্রায় ১,৫০,০০০ কিমি/ঘণ্টা গতিই যথেষ্ট।

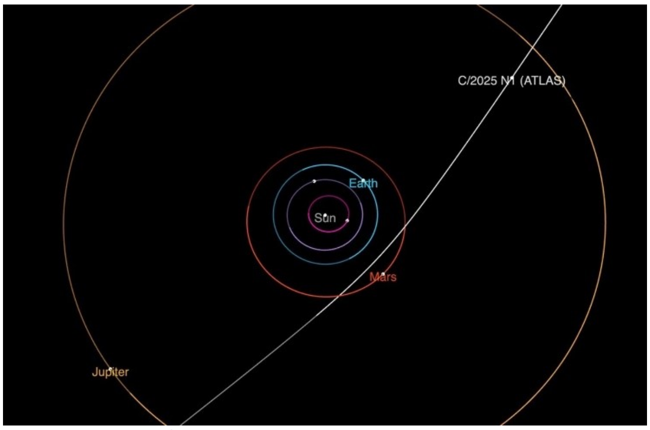

সৌরজগতের মধ্য দিয়ে 3I/ATLAS এর কক্ষপথ (NASA/JPL-Caltech)

দ্বিতীয়ত, 3I/ATLAS-এর কক্ষপথ সূর্যের চারপাশে অত্যন্ত বক্র (eccentric)। কক্ষপথের বিকেন্দ্রতা (eccentricity) মানে হল কতটা "টানা" বা লম্বাটে কক্ষপথটি— যেখানে 0 মানে একেবারে নিখুঁত বৃত্তাকার কক্ষপথ, এবং ১-এর নিচে মানে চ্যাপ্টা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ। কিন্তু ১-এর বেশি হলে বুঝতে হবে বস্তুটি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ এটি সৌরজগতে বাঁধা নয়।

শিল্পীর ছাপে তৈরি প্রথম নিশ্চিত আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু, 1I/'Oumuamua'-এর ছবি (ESO/M. Kornmesser)

3I/ATLAS-এর অনুমানিক বিকেন্দ্রতা ৬.৩, যা সৌরজগতের মধ্যে কোনো বস্তুর জন্য এ পর্যন্ত পরিলক্ষিত সর্বোচ্চ।

এর আগে এমন কিছু ঘটেছে?

২০১৭ সালে 'Oumuamua নামের এক দীর্ঘ, সিগার-আকৃতির বস্তুকে প্রথম আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এটি হাওয়াইয়ের Pan-STARRS1 টেলিস্কোপের মাধ্যমে ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীরা ৮০ দিন ধরে এটি পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হন যে এটি সৌরজগতের বাইরের উৎস থেকে এসেছে।

এরপর ২০১৯ সালে কমেট 2I/Borisov ধরা পড়ে, আবিষ্কার করেন শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গেন্নাদি বরিসভ। এইবার বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিশ্চিত হন এটি আন্তঃনাক্ষত্রিক।

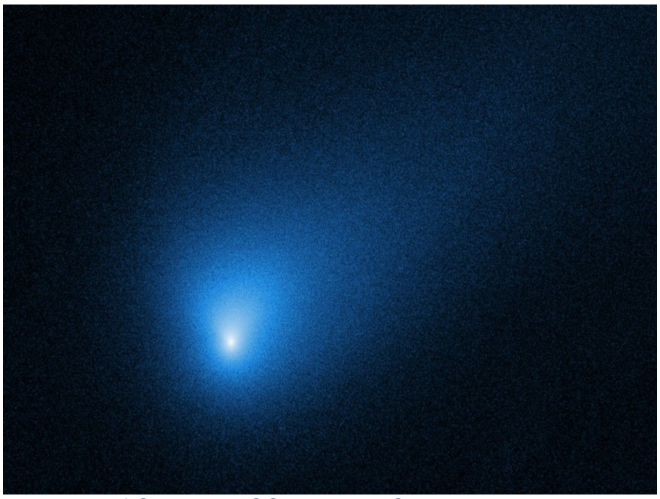

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা চিত্রিত আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূমকেতু 2I/Borisov [NASA/ESA/D. Jewitt (UCLA)]

এবারের 3I/ATLAS-এর উৎস শনাক্ত করতে বিজ্ঞানীদের মাত্র কয়েক দিন লেগেছে।

এটি কীভাবে এখানে এল?

আমরা এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণকারী বস্তু দেখেছি (3I/ATLAS সহ), তাই সঠিকভাবে বলা কঠিন যে তারা কীভাবে এখানে এসেছে।

তবে *The Planetary Science Journal*-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে এ জাতীয় বস্তু হয়তো আমরা যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় আছে। বিশেষ করে, এরা আমাদের নিকটবর্তী নাক্ষত্রিক প্রতিবেশী যেমন আলফা সেন্টরাই (মাত্র ৪.৪ আলোকবর্ষ দূরে) থেকে আসতে পারে।

আলফা সেন্টরাই ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, এবং আগামী ২৮,০০০ বছরে এটি সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছাবে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আমাদের সৌরজগতের মতো ওরাও যদি বস্তু ছুঁড়ে ফেলে, তবে ইতিমধ্যে আলফা সেন্টরাই থেকে প্রায় ১০০ মিটারের বড় প্রায় ১০ লাখ বস্তু আমাদের সৌরজগতের বাইরের অঞ্চলে অবস্থান করতে পারে। এবং এটি আরও দশগুণ বাড়তে পারে যতই তারা কাছাকাছি আসে।

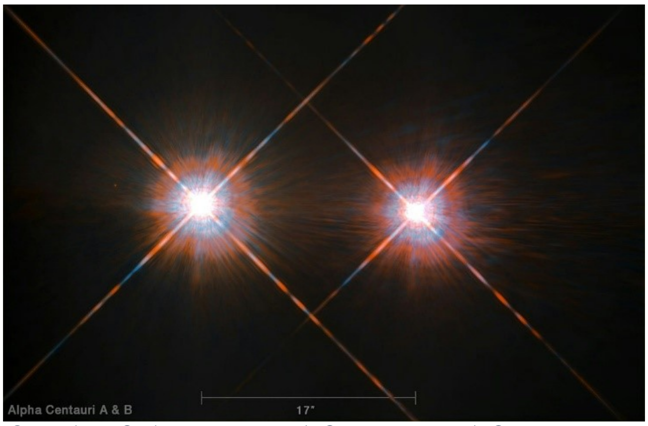

ট্রিপল স্টার সিস্টেম আলফা সেন্টোরির আলফা সেন্টোরি এ এবং আলফা সেন্টোরি বি (ESA/Hubble/NASA)

এই বস্তুগুলোর বেশিরভাগই অপেক্ষাকৃত কম গতিতে (প্রতি সেকেন্ডে ২ কিমি'র নিচে) নির্গত হয়েছে বলে মনে করা হয়, ফলে তারা ধীরে ধীরে আমাদের মহাজাগতিক আশেপাশে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু 3I/ATLAS-এর মতো উচ্চগতিতে প্রবেশ ও প্রস্থান করার সম্ভাবনা কম। গবেষণাটি আরও জানাচ্ছে যে, প্রতি বছর কিছু অতি ক্ষুদ্র (বালুকণার মতো) মাপের উল্কা হয়তো ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আলফা সেন্টরাই থেকে এসে পড়ছে।

কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ?

3I/ATLAS-এর মতো নতুন আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু আবিষ্কার করা শুধু বিরল বলেই এক্সাইটিং নয়, বরং এর প্রত্যেকটি বস্তু আমাদের গ্যালাক্সির এক অনন্য ঝলক দেখার সুযোগ দেয়। প্রত্যেক নিশ্চিত আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু আমাদের ডেটাবেসকে সমৃদ্ধ করে এবং বিজ্ঞানীদের আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে—এইসব অতিথির স্বভাব কী, তারা কেমনভাবে মহাকাশ পাড়ি দেয়, এবং তারা কোথা থেকে আসতে পারে।

এতে সাহায্য করছে নতুন প্রজন্মের শক্তিশালী পর্যবেক্ষণযন্ত্র, যেমন: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory। এই অবজারভেটরির প্রথম ১০ ঘণ্টার পরীক্ষামূলক ছবি তোলার মধ্যেই ২,১০৪টি আগে অজানা অ্যাস্টেরয়েড (গ্রহাণু) শনাক্ত হয়েছে, যা গড়ে অন্যান্য সমস্ত পর্যবেক্ষণাগার থেকে বার্ষিক প্রায় ২০,০০০টি এমন বস্তুর তুলনায় বেশি। গত ফেব্রুয়ারিতে প্রিপ্রিন্ট সার্ভার *arXiv*-এ পোস্ট করা একটি গবেষণাপত্রে গবেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে আগামী দশ বছরের জরিপে রুবিন ৬ থেকে ৫১টি আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন।

এটি ভবিষ্যতের এক অভাবনীয় ইঙ্গিত। বিশাল ফিল্ড-অব-ভিউ এবং একটানা আকাশ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকার কারণে, Rubin টেলিস্কোপ আমাদের আন্তঃনাক্ষত্রিক অনুসন্ধানে এক নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে — যেখানে একসময় বিরল মনে হওয়া আবিষ্কারগুলো হয়তো নিয়মিত ঘটতে পারে।

এখন কী হবে?

3I/ATLAS সম্পর্কে জানার এখনও অনেক কিছু বাকি। বর্তমানে, এটি IAU-এর মাইনর প্ল্যানেট সেন্টার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ধূমকেতু (comet) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে।

তবে কিছু বিজ্ঞানী মনে করছেন এটি হয়তো একটি অ্যাস্টেরয়েড, যার আকার প্রায় ২০ কিমি, কারণ এতে ধূমকেতুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যেমন উজ্জ্বল কোমা বা লেজ দেখা যায়নি। এর প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে আরও বেশি পর্যবেক্ষণ দরকার হবে।

এই মুহূর্তে, 3I/ATLAS সৌরজগতে ঢুকছে, এবং জুপিটারের কক্ষপথের একটু ভেতরে অবস্থান করছে। এটি ২৯ অক্টোবর তারিখে সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসবে — ঠিক মঙ্গলের চেয়েও একটু কাছাকাছি। এরপর এটি আবার গভীর মহাকাশের দিকে ছুটে যাবে এবং ডিসেম্বরে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে (তবে এটি পৃথিবীর জন্য কোনো হুমকি নয়)।

সে 3I/ATLAS ধূমকেতু হোক বা অ্যাস্টেরয়েড, এ এক অন্য তারকা-পুঞ্জের বার্তাবাহক। আপাতত, এদের দেখা পাওয়া বিরল হলেও, Rubin-এর মতো পরবর্তী প্রজন্মের পর্যবেক্ষণযন্ত্র চালু হলে, আমরা হয়তো এরকম বহু আন্তঃনাক্ষত্রিক সঙ্গীর খোঁজ পেতে পারি।

লেখক: জান্নাতুল মাইশা

প্রাণী

তিনটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙ আবিষ্কার

উত্তর-পশ্চিম পেরুর কুয়াশাচ্ছন্ন ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে ব্যাঙের Pristimantis গণের তিনটি নতুন প্রজাতি চিহ্নিত করেছেন হেরপেটোলজিস্টরা (উভচর ও সরীসৃপ বিশেষজ্ঞরা)।

পেরুর আন্দিজ পর্বতের দুর্গম এবং বিচ্ছিন্ন এলাকা থেকে বিজ্ঞানীরা ব্যাঙের তিনটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন, যা *Pristimantis* গণভুক্ত। এই গণটি বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ উভচর প্রাণীগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত ৬১৯টি প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাঙগুলোর নাম—*Pristimantis chinguelas, Pristimantis nunezcortezi*, এবং *Pristimantis yonke*।

পেরুর ইনস্টিটুটো পেরুয়ানো দে হারপেটোলজিয়া এবং সেন্ট্রো দে অর্নিথোলজিয়া ই বিওডাইভার্সিডাড-এর একদল উভচর বিশেষজ্ঞ এই আবিষ্কার করেছেন। তারা জানান, দেখতে ছোট এবং নিরীহ মনে হলেও, এই ব্যাঙগুলো আন্দিজ পর্বতমালার এখনো অজানা বিপুল জীববৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

Pristimantis chinguelas (Chávez et al.)

এই তিনটি প্রজাতিই উচ্চভূমির প্যারামো ও ‘এলফিন ফরেস্ট’ নামে পরিচিত বনাঞ্চলে বাস করে যা পরিবেশগতভাবে খুবই সংবেদনশীল ও জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এর মধ্যে *Pristimantis chinguelas* সবচেয়ে ছোট, যাকে Cerro Chinguelas পর্বতের প্রায় ৩,০০০ মিটার উচ্চতায় ব্রোমেলিয়াড উদ্ভিদের মাঝে পাওয়া গেছে। ব্যাঙটির গায়ে বড় বড় কাঁটার মতো টিউবার্কল এবং সুরেলা কণ্ঠস্বর রয়েছে, যা আর্দ্র রাতগুলোতে শোনা যায়। এই প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে স্থানীয় সংরক্ষণকর্মী এলিও নিউনেজ-কোর্টেজ-এর নামে।

এই অঞ্চলটিতে গবেষণা করা অত্যন্ত কঠিন। কঠিন পার্বত্য ভূখণ্ড, অনিশ্চিত আবহাওয়া ও সড়ক-সংযোগহীনতা একে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। গবেষকদের মতে, অনেক পর্বতশ্রেণী একেবারেই রাস্তাবিহীন এবং আবহাওয়া মুহূর্তেই পাল্টে যায়, যা গবেষণাকে শারীরিক ও কৌশলগতভাবে দুঃসাধ্য করে তোলে।

তবে এই প্রতিকূলতার মাঝেও গবেষক দলটি কোরডিলেরা দে হুয়ানকাবাম্বা এলাকায় আরও অনুসন্ধান চালানোর গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এই অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হলেও এখনো অনেকটাই অনাবিষ্কৃত। যদিও নতুন ব্যাঙগুলোকে আপাতত আইইউসিএনের রেড লিস্ট অনুযায়ী 'তথ্য অপর্যাপ্ত' (Data Deficient) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এর আশেপাশে বনাঞ্চলের ক্ষয়, অগ্নিকাণ্ড ও কৃষিকাজের সম্প্রসারণের লক্ষণ লক্ষ্য করেছেন।

গবেষকরা এই আবিষ্কারকে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে দেখছেন। পর্বতভিত্তিক এই সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রগুলোকে সুরক্ষিত না করলে তা স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। নতুন এই ব্যাঙগুলোর সন্ধান শুধু উভচর প্রাণীদের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেনি, বরং আন্দিজের দুর্গম অঞ্চলগুলোর পরিবেশগত মূল্যও তুলে ধরেছে।

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

রেফারেন্স: *DOI: 10.3897/evolsyst.9.148522*

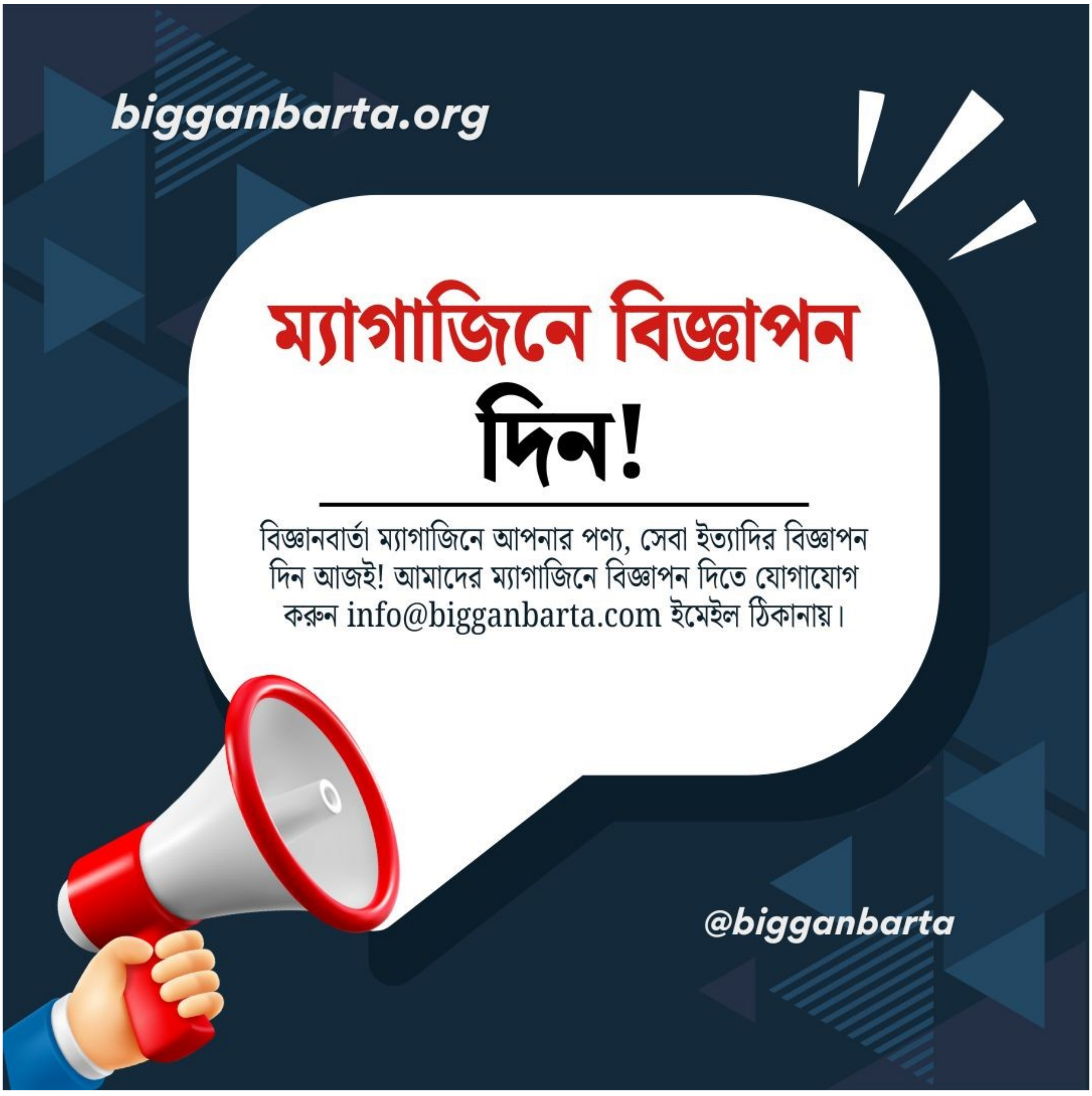

রসায়ন

ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ

ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে তৈরি কঠিন ইউরেনিয়াম অক্সাইড, যাকে ইয়েলো কেক (Yellowcake) ইউরেনিয়াম বলা হয়। পারমাণবিক জ্বালানিতে রূপান্তরের আগে ইয়েলোকেককে আরও প্রক্রিয়াজাত করা হয় (Nuclear Regulatory Commission/Flickr)

যখনই মানুষ "ইউরেনিয়াম" শব্দটা শোনে, অনেকের মাথায় প্রথমেই ভেসে ওঠে হিরোশিমা-নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাশরুম আকৃতির মেঘ, কোল্ড ওয়ারের উত্তেজনা, বা সায়েন্স ফিকশন সিনেমার সবুজ আলোতে জ্বলা রডের ছবি। কিন্তু ইউরেনিয়াম শুধু ভয় বা ধ্বংসের জ্বালানিই নয়, এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান, যা আধুনিক জ্বালানি, চিকিৎসার মতোর বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০২৫ সালের জুন মাসে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কয়েকটি স্থানে সামরিক হামলা চালায়, যেগুলোতে উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম থাকার সন্দেহ ছিল। এই ঘটনা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের (nuclear proliferation) আশঙ্কা নিয়ে বিশ্বজুড়ে নতুন করে আলোচনা উস্কে দেয়। বহু সংবাদে উঠে আসে যে, ইরান ৬০% ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু এই "৬০% সমৃদ্ধি" আসলে কী বোঝায়? সেটাই আমার আজকে জানবো। কিন্তু তার আগে ইউরেনিয়াম সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়া যাক।

ইউরেনিয়াম কী?

পারমাণবিক পর্যায় সারণিতে ইউরেনিয়ামের অবস্থান ৯২ নম্বরে। এটি একটি তেজস্ক্রিয় ধাতব মৌল। তেজস্ক্রিয়তা হলো এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যেখানে কিছু পরমাণু (যেমন ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা রেডিয়াম) নিজের থেকেই ভেঙে যায় এবং শক্তি নিঃসরণ করে।

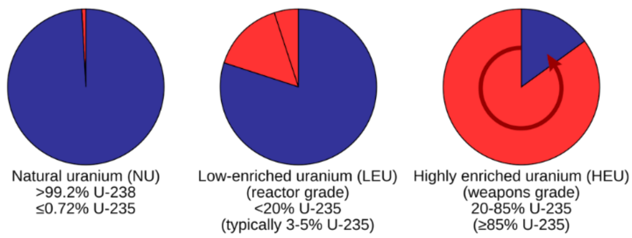

সমৃদ্ধকরণের মাত্রা ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর অনুপাতের উপর নির্ভর করে (Fastfission/Wikimedia Commons)

১৭৮৯ সালে জার্মান রসায়নবিদ মার্টিন হেনরিখ ক্ল্যাপরথ প্রথম ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেন। তিনি নতুন আবিষ্কৃত গ্রহ ইউরেনাস-এর নামে এর নামকরণ করেন। তবে ইউরেনিয়ামের প্রকৃত শক্তি জানা যায় ২০ শতকে, যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, ইউরেনিয়ামের পরমাণু

নিউক্লিয়ার ফিশান (nuclear fission) প্রক্রিয়ায় ভেঙে বিপুল শক্তি উৎপন্ন করতে পারে। এই বিভাজনে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস এক বা একাধিক অংশে ভাগ হয়ে যায় এবং সেইসাথে প্রচুর শক্তি ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরেনিয়াম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে – মাটি, পাথর, পানি, এমনকি গাছপালা ও প্রাণীতেও (অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে)। বেশিরভাগ ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় পৃথিবীর ভূত্বকে। সেখান থেকে এটি উত্তোলন করে এর সবচেয়ে কার্যকর তেজস্ক্রিয় রূপ (ইউরেনিয়াম-২৩৫) বেশি পরিমাণে পাওয়ার জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইনরিচমেন্ট বা সমৃদ্ধিকরণ বলা হয়।

সমৃদ্ধিকরণের জটিলতা

ইউরেনিয়াম-২৩৫ হলো ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ। অর্থাৎ, এটি একই মৌল, তবে এর ভর একটু বেশি বা কম। একে ভাবুন গাছে ফলা তরমজের মতো, সবগুলোই তরমুজ, কিন্তু ওজনে একটু কমবেশি। সেইভাবে, একটি মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপ মানে একই মৌলিক পরিচয়, শুধু ভর আলাদা।

প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ইউরেনিয়ামের বেশিরভাগ অংশই ইউরেনিয়াম-২৩৮, আর মাত্র ০.৭% থাকে ইউরেনিয়াম-২৩৫। এই ইউরেনিয়াম-২৩৫ মূলত নিউক্লিয়ার ফিশানের জন্য প্রয়োজনীয়। তাই ইউরেনিয়ামকে "সমৃদ্ধ" করা হয় – অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরিমাণ বাড়ানো হয়।

সমৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরেনিয়ামকে পারমাণবিক চুল্লি বা অস্ত্র তৈরির জন্য আরও উপযোগী করা যায়, কারণ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর পরিমাণ এতটাই কম থাকে যে তা নিউক্লিয়ার চুল্লি বা অস্ত্রে ভালোভাবে কাজ করতে পারে না। এই সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়া তিন ধাপে হয়ে থাকে:

প্রথমে ইউরেনিয়ামকে গ্যাসে রূপান্তর করা হয় – যেটাকে বলা হয় ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড। এরপর এই গ্যাস প্রবাহিত করা হয় "সেন্ট্রিফিউজ" নামে এক ধরনের যন্ত্রের মধ্যে, যা অত্যন্ত দ্রুত ঘোরে। ইউরেনিয়াম-২৩৫ অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় এটি ধীরে ঘুরে বাইরের দিকে যায়, আর ইউরেনিয়াম-২৩৮ অপেক্ষাকৃত ভারী হওয়ায় আলাদা হয়ে যায়। এইভাবে একবার ঘুরালেই যথেষ্ট হয় না – বহু সেন্ট্রিফিউজের মধ্য দিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর ঘনত্ব ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়।

৩% থেকে ৫% পর্যন্ত ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকলে এটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার উপযোগী হয়। এটিকে বলা হয় "নিম্নমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম"। ২০% বা তার বেশি হলে সেটিকে "উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম" বলা হয়। আর ৯০% বা তার বেশি হলে সেটি অস্ত্র-মানের ইউরেনিয়াম হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা পারমাণবিক বোমায় ব্যবহৃত হয়।

এই উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়াম দ্রুত, নিয়ন্ত্রণহীন পারমাণবিক বিক্রিয়াতে লিপ্ত হয় এবং তা তুলমূলক বেশি সময় টিকিয়ে রাখতে পারে, যার ফলে হঠাৎ প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, যা মূলত পারমাণবিক বিস্ফোরণের মূল কারণ।

ইউরেনিয়ামের বহুমুখী ক্ষমতা

বেশিরভাগ খবর ইউরেনিয়ামের সামরিক দিক নিয়ে কথা বললেও, এই মৌলটি আধুনিক জীবনে নীরব অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অল্পমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আজ বিশ্বজুড়ে উৎপন্ন মোট বিদ্যুতের প্রায় ১০% যোগান দেয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ তৈরি করে। এছাড়াও, ক্যান্সার চিকিৎসা ও বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত ইমেজিং প্রযুক্তিতেও ইউরেনিয়ামের ব্যবহার রয়েছে।

নৌবাহিনীতে, ইউরেনিয়াম-চালিত সাবমেরিন ও বিমানবাহী জাহাজগুলো ইউরেনিয়ামের শক্তির ওপর নির্ভর করে বহু বছর ধরে নীরবে ও দক্ষতার সঙ্গে চলতে পারে।

ইউরেনিয়াম এক দ্বৈততার প্রতীক – এটি এমন এক খনিজ যা প্রাচীন শিলা থেকে উত্তোলন করে শহরকে আলোকিত করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে শহর ধ্বংসও করতে পারে। এটি শুধু কোল্ড ওয়ারের অতীত স্মৃতি বা সায়েন্স ফিকশনের কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাস্তব, এটি শক্তিশালী, এবং এটি আজকের পৃথিবীকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হাসপাতাল, বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে কূটনীতি পর্যন্ত।

সবশেষে, প্রকৃত শক্তি ইউরেনিয়ামে নয় – বরং মানুষ এটিকে কীভাবে ব্যবহার করে, সেখানেই মূল প্রশ্ন।

লেখক: জান্নাতুল মাইশা

স্বাস্থ্য

কৃত্রিম রক্ত

angellodeco/Shutterstock

ভাবুন এমন একটা পৃথিবীর কথা, যেখানে রক্তের গ্রুপ নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। যেখানে অ্যাম্বুলেন্স কোনোকিছু নিয়ে না ভেবেই জীবন রক্ষাকারী রক্ত বহন করবে, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় রক্তের অভাব হবে না, আর বেগুনি রঙের এক তরল চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের বিকল্প হবে।

শুনতে কল্পবিজ্ঞানের মতো লাগলেও, জাপানের কাশিহারায় প্রফেসর হিরোমি সাকাইয়ের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছেন। তাঁদের লক্ষ্য: এমন কৃত্রিম রক্ত তৈরি করা যা যেকোনো মানুষ নিতে পারবে, যা সহজে নষ্ট হবে না (সার্বজনীন দাতা খ্যাত ও নেগেটিভ (O-) রক্ত ২-৩° সেলসিয়াস ঠান্ডা তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ ৩৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়) এবং যা যেকোনো জায়গায় খুব সহজেই ব্যবহার করা যাবে, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত।

এই উদ্যোগ শুধুমাত্র নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য নয়, বরং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ এবং জনসংখ্যার পরিবর্তনের সরাসরি প্রতিক্রিয়াও বটে। জাপানে বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে রক্তদাতার সংখ্যা কমছে, কিন্তু রক্ত সঞ্চালনের চাহিদা বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতি বছর ১১৮ মিলিয়ন রক্তদানের ৪০% আসে উচ্চ আয়ের দেশগুলো থেকে, যা বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১৬%। এর ফলে অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে রক্ত সংকট দেখা যায়, যা প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর কারণ হয়।

এই উদ্ভাবনের মূলে রয়েছে হিমোগ্লোবিন, যা লোহিত রক্তকণিকায় অক্সিজেন বহনকারী অণু। প্রফেসর সাকাইয়ের দল ডোনারের মেয়াদোত্তীর্ণ রক্ত থেকে হিমোগ্লোবিন বের করে এটিকে লিপিড মেমব্রেন দিয়ে ঢেকে দেয়, তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন ভেসিকল। এই ভেসিকলগুলো লোহিত রক্তকণিকার মতোই অক্সিজেন বহন করে কিন্তু এতে রক্তের

গ্রুপ চিহ্নিতকারী বৈশিষ্ট্য না থাকায়, এগুলো যেকোনো রোগীকে দেওয়া যায়। এগুলো ভাইরাস-মুক্তও। এই কৃত্রিম রক্তের বেগুনি রঙ একটি উপজাত, কিন্তু এটি অক্সিজেন সরবরাহ, সংক্রমণ সুরক্ষা এবং জৈব-সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে কার্যকর। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি সাধারণ তাপমাত্রায় দুই বছর এবং ফ্রিজে পাঁচ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

জাপানের কৃত্রিম রক্তের পরীক্ষা ২০২২ সালে ছোট পরিসরে শুরু হয়, যেখানে সুস্থ পুরুষ ভলেন্টিয়ারদের দেহে ১০০ মিলিলিটার পর্যন্ত হিমোগ্লোবিন ভেসিকল দেওয়া হয়েছিল। সামান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া কোনো গুরুতর প্রভাব দেখা যায়নি। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে গবেষক দলটি জানায় তারা এ ব্যাপারে দ্রুত সফলতার দিকে এগোচ্ছে।

নারা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ২০২৫ সালের মার্চের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরুর ঘোষণা করেছে। এই ধাপে ১৬ জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক স্বেচ্ছাসেবককে ১০০ থেকে ৪০০ মিলিলিটার কৃত্রিম রক্ত দেওয়া হবে। লক্ষ্য হলো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা। যদি ৪০০ মিলি ডোজ নিরাপদ প্রমাণিত হয়, তবে ২০৩০ সালের মধ্যে এটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার জন্য চালু করার লক্ষ্য রয়েছে।

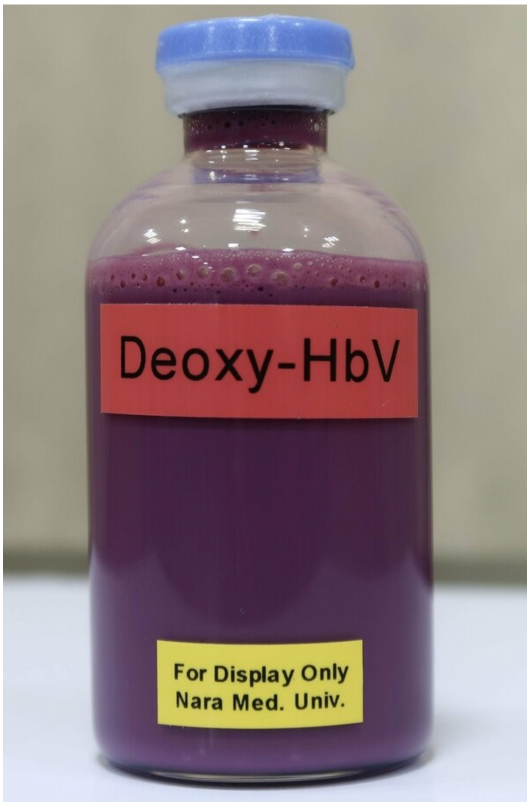

১ জুলাই, ২০২৪-এ তোলা এক ছবিতে দেখা যাচ্ছে নারা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি কৃত্রিম লোহিত রক্তকণিকার একটি ভায়াল (Kyodo)

পাশাপাশি, চুও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তেরুয়ুকি কোমাতসু অ্যালবুমিন-আবদ্ধ হিমোগ্লোবিন ভেসিকল নিয়ে গবেষণা করছেন যা রক্তচাপ স্থিতিশীল করতে এবং রক্তক্ষরণ ও স্ট্রোকের মতো গুরুতর অবস্থার চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারে। তার গবেষণায় আশাব্যঞ্জক ফল দেখা গেছে এবং হিউম্যান ট্রায়াল শীঘ্রই শুরু হবে।

ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টলের কোষ জীববিজ্ঞানী প্রফেসর অ্যাশ টয়ি এই প্রচেষ্টাকে “রক্ত সঞ্চালন চিকিৎসায় সম্ভাব্য সেরা অগ্রগতি” হিসেবে প্রশংসা করেছেন। তিনি সর্বজনীন সামঞ্জস্য এবং কৃত্রিম রক্তের বন্ধ রক্তনালীতে প্রবেশ করার সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছেন। তবে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে বর্তমান পদ্ধতি এখনও মানব-উৎসিত হিমোগ্লোবিনের উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে সিন্থেটিকভাবে উৎপাদিত রিকম্বিন্যান্ট হিমোগ্লোবিন আরও বেশি কার্যকর হতে পারে।

এই কৃত্রিম রক্ত অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় থাকা লক্ষ লক্ষ রোগী, ব্যাপক হতাহতের ঘটনায় ডাক্তার এবং দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় মানবিক কর্মীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সমাধান হতে পারে। এটি রক্ত টাইপিংয়ের সময় বাঁচাবে, সংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমাবে এবং বিশেষ ঠান্ডা-চেন লজিস্টিকের প্রয়োজন ছাড়াই মজুত করা যাবে।

প্রফেসর সাকাই বলেন, “কৃত্রিম রক্তকণিকার প্রয়োজন অনেক বেশি, কারণ বর্তমানে লোহিত রক্তকণিকার কোনো নিরাপদ বিকল্প নেই।”

২০৩০ সালের মধ্যে জাপানের এই উদ্ভাবন বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে পারে। রক্তের গ্রুপ নিয়ে আর ভাবনা নয়, বরং বেগুনি রঙের এক আশ্চর্য তরল বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাতে চলেছে।

জাপানের বিজ্ঞানীদের হাত ধরে তৈরি এই কৃত্রিম রক্ত শুধু জরুরি পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচাবে না, বরং রক্তের অভাবের মতো চিরন্তন সমস্যার এক নির্ভরযোগ্য সমাধান দেবে। যদি সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়, ২০৩০ সালের মধ্যে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার মানবতার জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, যেখানে রক্ত সঞ্চালনের ভবিষ্যৎ আর কখনই আগের মতো থাকবে না।

লেখক: রামিছা আলী সালওয়া

রসায়ন

Michel VIARD/iStock

আমরা সাধারণত অক্সিজেনকে জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখি, নির্বিঘ্নে শ্বাস নেওয়ার উপাদান, জীবনধারণের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু অক্সিজেন আসলে রাসায়নিক ভাবে অত্যন্ত সক্রিয় (reactive) মৌল। আপনি কাঠ পোড়ানোর সময় দেখে থাকবেন যে অক্সিজেন কতটা সক্রিয়ভাবে জ্বালানি পোড়াতে সাহায্য করে। তাহলে প্রশ্ন হলো, এত জীবের জীবনধারণের জন্য কেন এই রিঅ্যাক্টিভ মৌলটি এত গুরুত্বপূর্ণ?

জীবজগতে হাজার রকমের বিপাকক্রিয়া (metabolism) বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে জীবন টিকে থাকে। কিন্তু প্রায় সব ইউক্যারিওট (যাদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে) এবং বহু প্রোক্যারিওট (যাদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না) অক্সিজেন ব্যবহার করে বেঁচে থাকে।

এখানে মূলত হেটারোট্রোফদের (heterotroph) কথা বলা হচ্ছে। হেটারোট্রোফ হলো এমন সব জীব যারা নিজেদের পুষ্টি ও শক্তি পায় অন্য জৈব পদার্থ খেয়ে, যেমন মানুষ। তবে সবাই এমন না—উদ্ভিদের মতো কিছু জীব নিজের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন নেয় বাতাসের CO_2 থেকে, যদিও শক্তির জন্য অন্য উৎস লাগে।

অক্সিজেনের রসায়ন: শক্তি তৈরির কারখানা

হেটারোট্রোফরা যখন খাবার খায়, তখন সেই জৈব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন ছিঁড়ে নেয়। এই ইলেকট্রনগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লির (membrane) এক এনজাইম থেকে আরেক এনজাইমে গিয়ে ছোট একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরি করে, যা প্রোটনগুলোকে এক পাশে ঠেলে পাঠায়। অক্সিজেন যেহেতু উচ্চ বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন (high electronegativity), তাই এই ইলেকট্রন পরিবহন শৃঙ্খলের (electron transport chain) শেষ গন্তব্য হিসেবে কাজ করে। এটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং দুটি প্রোটন নিয়ে পানি তৈরি করে।

এই প্রক্রিয়ায় ঝিল্লির এক পাশে জমা হওয়া প্রোটনগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন চ্যানেলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, ঠিক যেন ছোট্ট কোনো জলবিদ্যুৎ বাঁধ। এই প্রোটিন, যাকে এটিপি সিন্থেস (ATP synthase) বলা হয়, টার্বাইনের মতো ঘুরতে ঘুরতে শক্তি উৎপন্ন করে যা অ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) আকারে সঞ্চিত থাকে। কোষ এই শক্তি নিজের কাজে লাগায় অথবা শরীরের অন্য অংশে পাঠিয়ে দেয়।

বিকল্প কী ছিল?

জীব জগৎ অক্সিজেন ছাড়াও অনেক কিছু ব্যবহার করতে পারে ইলেকট্রন গ্রহণকারী হিসেবে, যেমন সালফেট, নাইট্রেট বা আয়রন। কিন্তু অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি শক্তি দেয়।

Astrobiology জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের অধ্যাপক ডেভিড ক্যাটলিং ও

তার গবেষণা দল উল্লেখ করেছেন, “ইলেকট্রন স্থানান্তরের সময় অক্সিজেনের হ্রাস (reduction) সবচেয়ে বেশি ফ্রি এনার্জি মুক্ত করে, ফ্লোরিন আর ক্লোরিন বাদে।”

ফ্লোরিন অক্সিজেনের চেয়েও বেশি শক্তি দিতে পারে, কিন্তু সমস্যা হলো ফ্লোরিন যখন জৈব পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। তাই এটা জীবদেহে ব্যবহারের যোগ্য নয়। ক্লোরিনও একই রকম বিষাক্ত। ফলে অক্সিজেনের আরেকটি বড় সুবিধা হলো, অর্থাৎ এটি বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে না। অক্সিজেন ব্যবহার করে যে বিপাকীয় প্রক্রিয়া চলে (aerobic respiration), তাতে শুধু পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা শরীর সহজেই সামলাতে পারে।

তবে এর বিপরীত দিকেও কথা আছে। অক্সিজেন অতিরিক্ত হয়ে গেলে কোষের ভেতরের DNA, প্রোটিনসহ বিভিন্ন জৈব উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এজন্যই আমাদের শরীর “অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট”-এর সাহায্য নেয়, যা এই ক্ষতি থেকে কোষকে রক্ষা করে।

সহজলভ্যতা: অক্সিজেনের বড় শক্তি

ফ্লোরিন বা ক্লোরিনের তুলনায় অক্সিজেন অনেক বেশি সহজলভ্য। যেহেতু উদ্ভিদ ও শৈবাল প্রতিনিয়ত ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে, তাই এটি বাতাসে ও পানিতে প্রচুর মজুত থাকে। আর গ্যাস হিসেবে অক্সিজেন ঝিল্লির মধ্য দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে, যেটা প্রাণের পক্ষে দারুণ সুবিধাজনক।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে—বায়ুমণ্ডলের ৭৮% যেটা নাইট্রোজেন, সেটা কেন ব্যবহার করা হয় না?

অধ্যাপক ক্যানফিল্ড বলেন, “সমস্যা হলো নাইট্রোজেন একটি ত্রিবন্ধনে আবদ্ধ (triple bonded), আর এই বন্ধন ভাঙা খুবই কঠিন।” যদিও কিছু বিশেষ জীব আছে যারা প্রচুর শক্তি খরচ করে এই বন্ধন ভাঙতে পারে, এবং তা থেকেই জীব জগতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে, কিন্তু সেটা সহজ ও স্বাভাবিক উপায় নয়।

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান: অক্সিজেনের বিশেষত্ব

অক্সিজেনের এই অনন্য গুণের পেছনে আছে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের খেলা। সাধারণ অবস্থায় অক্সিজেন একই স্পিনের (same spin state) ইলেকট্রন গ্রহণ করে, ইলেকট্রন জোড়া নয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি উচ্চ মাত্রায় জমে থাকা সত্ত্বেও দুম করে অতি বিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না, কিন্তু যখন একে একে ইলেকট্রন সরবরাহ করা হয়, তখন প্রচুর শক্তি ছাড়ে—যা আমাদের কাজে লাগে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের বিবর্তনীয় জীবরসায়নের অধ্যাপক নিক লেইন বলেন, “অক্সিজেনের আসল কৌশল হলো—এটা একসাথে না, বরং ধাপে ধাপে ইলেকট্রন গ্রহণ করে, ফলে প্রচুর শক্তি ছাড়তে পারে।”

তাই অক্সিজেন?

সব বিবেচনায় অক্সিজেন যেন এক “সুইট স্পট”-এ অবস্থান করছে। এটা ক্লোরিন বা ফ্লোরিনের মতো অতিরিক্ত বিক্রিয়াশীল না, আবার নাইট্রোজেনের মতো চরম স্থিতিশীলও না। সালফেট বা নাইট্রেটের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর শক্তির উৎস। এটি সহজলভ্য, পরিবহনযোগ্য, এবং বিপাক শেষে বিষাক্ত কোনো বর্জ্যও তৈরি করে না।

সবচেয়ে বড় কথা, উদ্ভিদরা প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য এই গ্যাসটি উৎপাদন করে চলেছে। আমরা শুধু এটাকে কাজে লাগাই, জীবনের ইঞ্জিন চালানোর জ্বালানির মতো করে।

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

ভাইরাস

বিরল ভাইরাস আবিষ্কারে বিড়াল

পিপার নামের একটি বিড়াল আবিষ্কার করে ফেললো একটি নতুন ভাইরাস। তার শিকারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পেলেন Orthoreovirus-এর এক নতুন স্ট্রেইন, যা এখনও ভালোভাবে বোঝা যায়নি, তবে আগাম সতর্কতার জন্য এই ধরনের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

John Lednicky/UFHealth

আমেরিকার ফ্লোরিডার এক সাধারণ গৃহপালিত বিড়াল, যার নাম পিপার, আবারও খবরের শিরোনামে। এর আগে সে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম চিহ্নিত *jeilongvirus*-এর আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এবার সে আবারও নিয়ে এলো একটি মৃত ছোট প্রাণী, যার দেহে পাওয়া গেল একেবারে নতুন এক ভাইরাস!

এই নতুন ভাইরাসটি পাওয়া গেছে Everglades short-tailed shrew (*Blarina peninsulae*) নামে একটি ছোট স্তন্যপায়ীর মৃতদেহে, যেটা পিপার তার শিকারের পর বাড়িতে নিয়ে আসে। বিড়ালের মালিক ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার একজন ভাইরোলজিস্ট ড. জন লেডনিকি তখনই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে প্রাণীটিকে গবেষণাগারে নিয়ে যান। ফলাফল ছিল চমকে দেওয়ার মতো—একটি সম্পূর্ণ নতুন *Orthoreovirus*-এর উপস্থিতি ধরা পড়ে যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

গত ১০ জুলাই, ২০২৫ এ *Microbiology Resource Announcements* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে এই আবিষ্কারের কথা তুলে ধরা হয়। নতুন চিহ্নিত এই ভাইরাসের নাম রাখা হয়েছে “Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1”।

Orthoreovirus একটি এমন ভাইরাস গণ, যা পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সংক্রমিত করে এবং এটি মানুষের মধ্যেও ছড়াতে পারে। যদিও ১৯৫০-এর দশকে এই ধরনের ভাইরাস প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুরুতে একে “orphan virus” বলা হত কারণ তখন মনে করা হত এটি কোনো রোগ সৃষ্টি করে না।

“এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পিপার ভাইরাস আবিষ্কার করতে সাহায্য করল”

তবে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বলছে, এই ভাইরাস শিশুদের ক্ষেত্রে মেনিনজাইটিস, এনসেফেলাইটিস এবং অন্ত্রের প্রদাহ ঘটাতে পারে। এছাড়াও এটি মূলত শ্বাসতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায় এবং পায়খানা বা হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

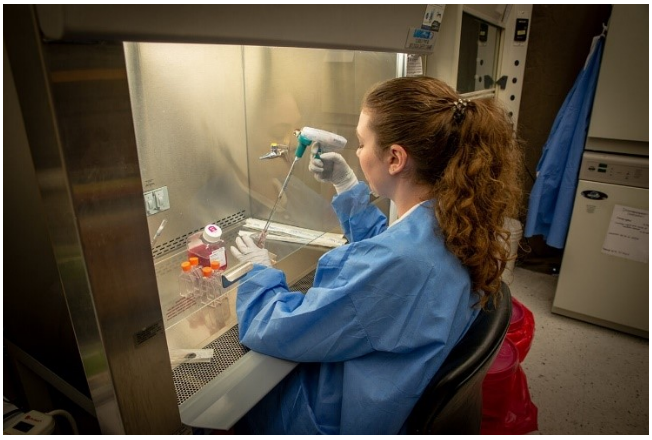

ল্যাবে প্রধান গবেষণা এমিলি ডেরুইটার (Andy Williams/UFHealth)

ড. লেডনিকি বলেন, "আমরা যত খুঁজি, ততই নতুন ভাইরাস খুঁজে পাই।" অর্থাৎ প্রকৃতিতে এরকম অসংখ্য অজানা ভাইরাস আছে, যা আমাদের চোখের আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গবেষকরা এখন নতুন এই ভাইরাসটি বিভিন্ন প্রাণীর রক্তরসের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে চান যে এটি কাদের সংক্রমিত করতে পারে, কতটা ভয়ানক হতে পারে এবং কীভাবে ছড়াতে পারে।

তবে আপাতত চিন্তার কিছু নেই বলে জানান গবেষণার প্রধান গবেষক এমিলি ডেরুইটার, যিনি ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডার পিএইচডি ছাত্রী। "এখনো এই ভাইরাস সম্পর্কে যথেষ্ট কিছু জানা যায়নি, তাই আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই," তিনি বলেন।

পিপার একেবারে সুস্থ আছে এবং তার শিকারের প্রতিভা যেন বিজ্ঞানের জন্য আশীর্বাদ। "এটা একেবারেই সুযোগের ভিত্তিতে হওয়া গবেষণা," বলেন লেডনিকি। "একটা মৃত প্রাণী যদি খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা কবর দেওয়ার আগে পরীক্ষাও করা যায়—কারণ, সেটার ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারে ভবিষ্যতের এক মহামূল্যবান তথ্য।"

লেখক: সুমাইয়া আক্তার রিয়া

রেফারেন্স: *DOI: [10.1128/mra.00219-25](10.1128/mra.00219-25)*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

১১ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের 'কসমিক আউল'

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ১১ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে দুটি রিং গ্যালাক্সির বিরল সংঘর্ষে তৈরি এক পেঁচামুখো গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছে, যাকে বর্ণনা করা হচ্ছে "কসমিক আউল" নামে। এই গঠন মহাবিশ্বের অতীতে নক্ষত্রের জন্ম, গ্যালাক্সির বিকাশ ও ব্ল্যাক হোলের প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য এক অনন্য প্রাকৃতিক গবেষণাগার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

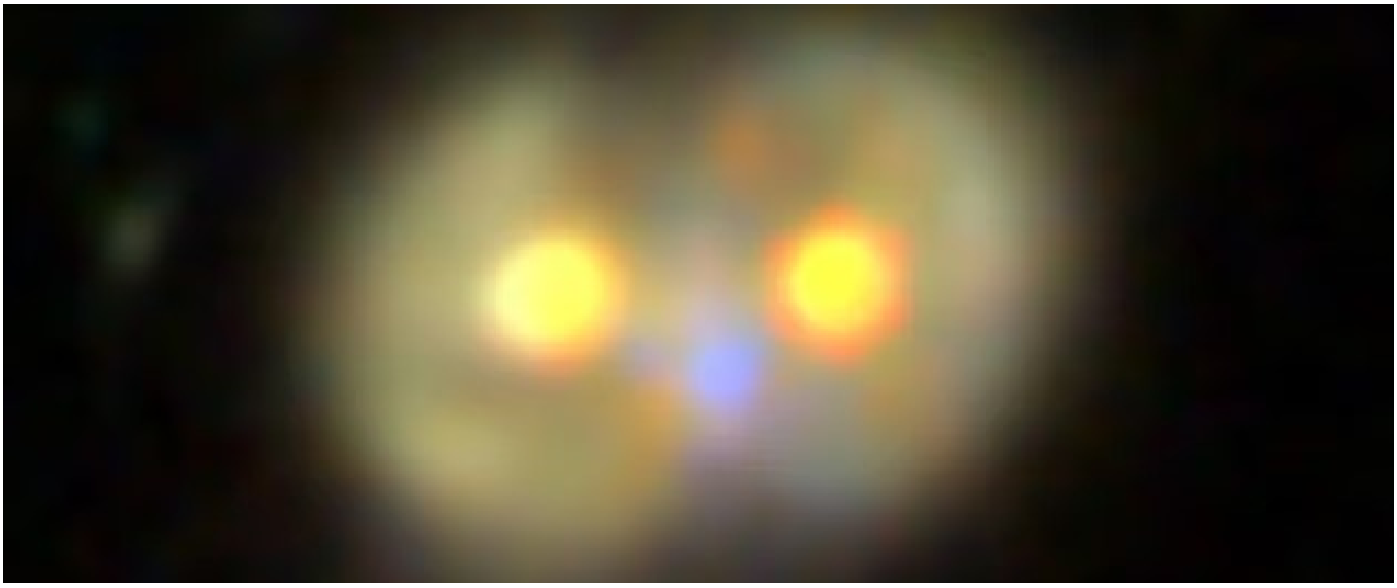

Li et al.

সম্প্রতি জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের (JWST) ডেটা ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একটি বিরল এবং আশ্চর্যজনক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গঠনের সন্ধান পেয়েছেন, যা দেখতে অনেকটা পেঁচার মুখের মতো। এই গঠনটি ১১ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, মহাবিশ্বের অতীতের এক দৃশ্য — যেখানে দুটি বিরল রিং গ্যালাক্সির সংঘর্ষ ঘটেছে, সৃষ্টি করেছে এই 'কসমিক আউল'-এর।

গ্যালাক্সি সাধারণত বিভিন্ন আকৃতির হয় — যেমন আমাদের মিল্কিওয়ে হলো একটি সর্পিল (spiral) গ্যালাক্সি। তবে রিং গ্যালাক্সি একটি অত্যন্ত দুর্লভ রূপ, যেখানে একটি ছোট গ্যালাক্সি তার বড় সঙ্গীর মধ্য দিয়ে গিয়ে ধাক্কা খায়, ফলে তার কেন্দ্রের চারপাশে একটি গ্যাস ও তারকাখচিত রিং তৈরি হয়।

রিং গ্যালাক্সি মহাবিশ্বে অত্যন্ত বিরল। ধারণা করা হয় সব গ্যালাক্সির মধ্যে মাত্র ০.০১% হচ্ছে রিং গ্যালাক্সি। কিন্তু এই "কসমিক আউল" বা "নক্ষত্রপেঁচা" আরও অস্বাভাবিক, কারণ এটি দুইটি রিং গ্যালাক্সির সংঘর্ষে তৈরি! গবেষণাপত্রটি ১১ জুন, ২০২৫ তারিখে *arXiv*-এ প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি এখনও পিয়ার-রিভিউ হয়নি, তবে এর অস্তিত্ব ইতোমধ্যেই আরেক গবেষকদল আলাদাভাবে নিশ্চিত করেছে, যারা এটিকে "ইনফিনিটি গ্যালাক্সি" নামে ডেকেছে।

চীনের চিনহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল শিক্ষার্থী মিংইউ লি ও তার সহকর্মীরা JWST-এর পাবলিক ডেটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই পেঁচামুখো গ্যালাক্সি জোড়ার সন্ধান পান। তাঁরা মহাকাশের বৃহত্তম মোজাইক 'COSMOS ফিল্ড' অঞ্চলের রেডিও সোর্সগুলো বিশ্লেষণ করছিলেন। হাই-রেজুলিউশন ইমেজে এই গ্যালাক্সি জোড়াটি চোখে পড়ে — দুইটিই রিং গ্যালাক্সি, এবং আকারে মিল্কিওয়ের চার ভাগের এক ভাগ, প্রায় ২৬,০০০ আলোকবর্ষ চওড়া।

প্রত্যেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল, যার প্রতিটিই সূর্যের চেয়ে ১ কোটিরও বেশি গুণ ভারী। এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলদুটি মিলে তৈরি করেছে পেঁচার দুটি চোখ। ব্ল্যাক হোল দুটি এখনো তাদের চারপাশ থেকে পদার্থ টেনে নিচ্ছে, যাকে বলে "active galactic nuclei" — অর্থাৎ সক্রিয় গ্যালাক্টিক কেন্দ্র।

তবে এই মহাকাশীয় পেঁচার চোখ যতটা শান্ত, তার "ঠোঁট" বা সংঘর্ষস্থল ততটাই উত্তাল। সেখানে গ্যালাক্সি দুটি একে অপরের গায়ে ধাক্কা দিয়ে একটি বিস্ময়কর পরিমাণে আণবিক গ্যাস জমাট করে তুলেছে। গবেষকদের মতে, এটি হলো তারার জন্মের কাঁচামাল, যা এই সংঘর্ষে চাপে পড়ে নতুন তারা তৈরিতে ব্যস্ত। ALMA টেলিস্কোপের ডেটায় দেখা গেছে, এই অঞ্চলটিতে বর্তমানে চলছে বিশাল তারাগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

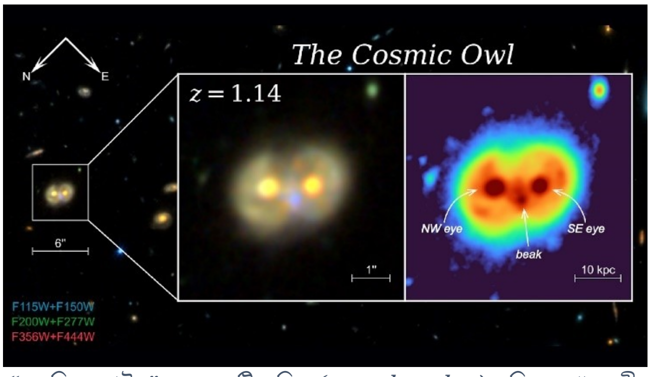

"কসমিক আউল"-এর একটি রঙিন (pseudo-color) ছবি, যেখানে নীল, সবুজ ও লাল ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে। ডান পাশের চিত্রে NIRCam-এর সব ওয়াইড ব্যান্ড (F090W থেকে F444W পর্যন্ত) একত্রে সংযোজন করে PSF-ম্যাচিংয়ের পর দেখানো হয়েছে। ডান পাশের চিত্রে তিনটি প্রধান উপাদান— উত্তর-পশ্চিম চোখ (NW eye), দক্ষিণ-পূর্ব চোখ (SE eye), এবং ঠোঁট চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে। (Li et al.)

আরও চমকপ্রদ তথ্য মিলেছে নিউ মেক্সিকোতে অবস্থিত Very Large Array (VLA) টেলিস্কোপের রেডিও-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ থেকে। এক গ্যালাক্সির ব্ল্যাক হোল থেকে নির্গত চার্জযুক্ত কণার জেট ওই গ্যাসে আঘাত করছে, ফলে গ্যাস আরও সঙ্কুচিত হয়ে বিশাল এক 'তারা তৈরির নার্সারি' বা তারাকেন্দ্র তৈরি হয়েছে।

গ্যালাক্সির সংঘর্ষ অনেক সময় কয়েক শ' মিলিয়ন বছর স্থায়ী হয়। গবেষকরা ধারণা করছেন, এই সংঘর্ষটি ঘটেছিল প্রায় ৩.৮ কোটি বছর আগে। ফলে এই পেঁচাসদৃশ দৃশ্যটি এখনও অনেক দিন ধরেই আমাদের সামনে দৃশ্যমান থাকবে।

তবে এর সৌন্দর্যই একমাত্র গুরুত্ব নয়। মিংইউ লির মতে, এটি বিজ্ঞানীদের জন্য একটি "প্রাকৃতিক পরীক্ষাগার", যেখানে গ্যালাক্সির বিবর্তনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া একসাথে চলছে — যেমন, রেডিও জেট ও শকওয়েভের প্রভাবে নক্ষত্রের জন্মের হার দ্রুত বেড়ে যাওয়া। এটি বোঝায় যে, প্রাচীন মহাবিশ্বে নক্ষত্রের ভর এত দ্রুত কীভাবে গঠিত হয়েছিল, তার এক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই গঠনেই নিহিত থাকতে পারে।

গবেষকরা ভবিষ্যতে আরও সিমুলেশন চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন যে, ঠিক কী অবস্থায় এমন “টুইন-রিং” ধাঁচের বিরল গঠন তৈরি হয়।

JWST আগে এরকম নানা অদ্ভুত গঠন খুঁজে পেয়েছে — যেমন প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো গ্যালাক্সির জোট, কিংবা নবজন্ম নেওয়া নক্ষত্রের গ্যাসের ধোঁয়া, যা দেখতে অনেকটা বিড়ালের লেজের মতো। এই নতুন “কসমিক আউল” সেগুলোর কাতারেই একটি নতুন, রহস্যময় সংযোজন। আমাদের মহাবিশ্ব যে এক বিশাল কল্পনালোক, তারই আরেকটি প্রমাণ এটা।

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: *DOI: 10.48550/arxiv.2506.10058*

প্রাণী

নীল হাঙর নিজের রঙ পরিবর্তন করতে পারে!

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নীল হাঙরের ত্বকে থাকা বিশেষ ন্যানো-গঠন শুধু নীল রঙই তৈরি করে না, বরং ক্যামেলিয়নের মতো রঙ বদলাতেও সক্ষম। গহ্বরে থাকা গ্যানিন স্ফটিক ও মেলানিন এই রঙ নিয়ন্ত্রণে মূল ভূমিকা রাখে। এটি হাঙরের ছদ্মবেশ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

Martin Prochazkacz/Shutterstock.com

নীল হাঙর বা ব্লু শার্ক (*Prionace glauca*) তার নামের চেয়েও বেশি কিছু হতে পারে। সামুদ্রিক এই চতুর শিকারির ত্বকে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু ন্যানো-গঠন আবিষ্কার করেছেন যা শুধু হাঙরের চিরাচরিত নীল রঙই তৈরি করে না, বরং ক্যামেলিয়নের মতো রঙ বদলানোর ক্ষমতাও রাখতে পারে।

প্রাণীরা বিভিন্নভাবে তাদের রঙ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ তাদের শরীরে থাকা রঞ্জক কোষ (pigmented cells) ব্যবহার করে চারপাশের আলো থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wavelength) ছেঁটে ফেলে কাঙ্ক্ষিত রঙ ফুটিয়ে তোলে। আবার কেউ কেউ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গঠনের মাধ্যমে আলোর নির্দিষ্ট তরঙ্গ ছড়িয়ে বা প্রতিফলিত করে রঙ সৃষ্টি করে – যেমন ময়ূরের পালক।

কিন্তু খুব অল্প কিছু প্রাণী পরিবেশ অনুযায়ী নিজেদের রঙ-গঠন সামঞ্জস্য করতে পারে। তারা কীভাবে আলো শোষণ বা প্রতিফলন করে তা পরিবর্তন করতে সক্ষম।

সিটিওয়াই ইউনিভার্সিটি অব হংকং (City University of Hong Kong – CUHK)-এর গবেষকরা নতুন এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে নীল হাঙরও এমনই এক প্রাণী যার ত্বক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রঙ পাল্টাতে পারে।

নামে যেমন বোঝা যায়, নীল হাঙরের পিঠ গাঢ় নীল এবং পেটের দিক তুলনামূলক হালকা রঙের হয়ে থাকে। এদের ত্বকে ক্ষুদ্র দাঁতের মতো আঁশ থাকে, যাকে বলা হয় dermal denticles। প্রতিটি আঁশের ভেতরে থাকে একটি pulp cavity, যা রঙ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

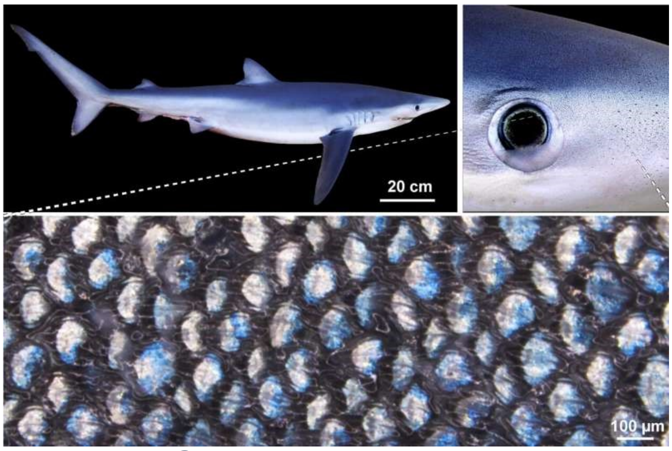

ব্লু শার্কের ডার্মাল ডেন্টিক্যালস (Dr. Viktoriia Kamska)

গবেষকরা ইলেকট্রন ও অপটিকাল মাইক্রোস্কোপ, স্পেকট্রোস্কোপি এবং অন্যান্য ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই আঁশগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা দেখেন, এই গহ্বরে guanine স্ফটিক থাকে যা নীল আলো প্রতিফলিত করে। এছাড়াও থাকে melanin নামক রঞ্জকের ক্ষুদ্র থলি, যা অন্যান্য রঙ শোষণ করে।

CUHK-এর মলিকিউলার বায়োলজিস্ট ভিক্টোরিয়া কামস্কা বলেন, "এই উপাদানগুলো আলাদাভাবে কোষে থাকে – যেন একদিকে আয়নাভর্তি ব্যাগ, আরেকদিকে কালো রঙ শোষণকারী ব্যাগ – কিন্তু একসঙ্গে এমনভাবে সাজানো যে তারা একসঙ্গে কাজ করে।"

গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এই গঠনের ফলে শুধু হাঙরের নীল রঙই তৈরি হয় না, বরং এই গঠন তাদের রঙ পাল্টানোর সম্ভাবনাও রাখে। Guanine স্ফটিকগুলোর স্তরের মধ্যে ব্যবধান যত সংকীর্ণ, ত্বক তত বেশি নীল দেখায়। কিন্তু যদি সেই ব্যবধান একটু বিস্তৃত হয়, তবে তা সবুজ বা হলুদ রঙও তৈরি করতে পারে।

গিরগিটির বা ক্যামেলিয়নের ক্ষেত্রেও রঙ বদলানোর পদ্ধতি গঠিত হয় guanine স্ফটিকের বিন্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে। হাঙরের ক্ষেত্রেও এটি প্রাকৃতিকভাবে তাদের ছদ্মবেশ (camouflage) ক্ষমতা বাড়াতে পারে। যেমন, যদি তারা গভীর পানিতে ডুব দেয়, তাহলে পানির চাপে স্ফটিক স্তরগুলো আরও কাছাকাছি চলে আসবে এবং ত্বক আরও গাঢ় হবে, যা গভীর পানির অন্ধকার পরিবেশের সঙ্গে মিলে যাবে।

তবে এই প্রভাব আপাতত গবেষণাগারে কেবল সিমুলেশন বা কম্পিউটার মডেলিংয়ের মাধ্যমে দেখা গেছে। গবেষকরা এখন প্রকৃত পরিবেশে, হাঙরের উপর এই প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে তা অনুসন্ধান করতে চান। এর মাধ্যমে জানা যাবে, প্রকৃতি কীভাবে এত সূক্ষ্ম স্তরে (ন্যানোস্কেল) রঙ তৈরি করে।

লেখক: জারা জাইন্ড

জীববিজ্ঞান

ল্যাবে তৈরি ক্ষুদ্র অঙ্গ এখন নিজের রক্তনালীও গড়ছে

গবেষকরা এখন এমন ক্ষুদ্র অঙ্গ বা অর্গানয়েড তৈরি করতে সক্ষম, যেগুলো নিজে থেকেই রক্তনালী গঠন করতে পারে। এতে অঙ্গগুলোর জটিলতা ও কার্যকারিতা বেড়েছে, যা ভবিষ্যতে মানবদেহের প্রকৃত অঙ্গের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের পথ তৈরি করতে পারে।

গবেষকরা ল্যাবরেটরিতে এমন অত্যাধুনিক ক্ষুদ্র অঙ্গ তৈরি করতে পেরেছেন, যেগুলো নিজের রক্তনালী গড়ে তুলতে সক্ষম। হার্ট, লিভার, ফুসফুস এবং অন্ত্রের অনুকরণে তৈরি এই গঠনগুলো মানুষের বিকাশের এমন কিছু জটিল মডেল উপস্থাপন করছে, যেগুলোতে আগে দেখা না-পাওয়া কোষের বিন্যাস ও গঠন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

"অর্গানয়েডের ভাস্কুলারাইজেশন (রক্তনালীনির্মাণ) এখন খুবই আলোচিত বিষয়," বলছেন বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস

জেনারেল হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট এবং স্টেম-সেল জীববিজ্ঞানী রিউজি মোরিজানে।

এই অর্গানয়েডগুলো আসলে ক্ষুদ্র থ্রিডি কোষ গঠন, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ পরীক্ষায় এবং রোগ ও শারীরবৃত্তীয় বিকাশ অধ্যয়নে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বেশিরভাগ অর্গানয়েডে রক্তবাহী নালী থাকে না, ফলে রক্ত, পুষ্টি ও অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে না। এর ফলে এদের আকার, কার্যকারিতা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পরিপক্ক হওয়ার ক্ষমতা সীমিত থাকে। যেমন, কিডনিকে সঠিকভাবে প্রস্রাব তৈরি করতে হলে রক্ত ফিল্টার করার জন্য রক্তনালীর দরকার, আবার ফুসফুসকে গ্যাস বিনিময় (অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড) করতে হলেও তাই প্রয়োজন।

একজন গবেষকের হাতে মানুষের সেরিব্রাল অর্গানয়েড সম্বলিত একটি ফ্লাস্ক [NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)]

সম্প্রতি *Science* এবং *Cell* জার্নালে দুটি গবেষক দল নতুন এক পদ্ধতির মাধ্যমে ‘রক্তনালীসহ অর্গানয়েড’ তৈরির কথা জানায়। তারা প্লুরিপোটেন্ট স্টেম সেল (যা শরীরের প্রায় যেকোনো কোষে রূপ নিতে পারে) থেকে শুরু করে কোষগুলোকে অর্গানের টিস্যুর পাশাপাশি রক্তনালীতেও রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন।

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্টেম-সেল জীববিজ্ঞানী এবং গবেষণার গবেষক অস্কার অ্যাবিলেজ বলেন, “এই মডেলগুলো সত্যিই এই পদ্ধতির শক্তি দেখাচ্ছে।”

প্রাথমিক প্রয়াস

প্রথমদিকে রক্তনালীবিশিষ্ট অর্গানয়েড তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল রক্তনালীর টিস্যুকে আলাদাভাবে বড় করে, সেটিকে অন্যান্য কোষের সঙ্গে একত্রিত করে ‘অ্যাসেমব্লয়েড’ নামক গঠন বানিয়ে। তবে এই মডেলগুলো এখনও প্রকৃত অঙ্গের কাঠামো ও পরিপক্কতা অনুকরণে সীমিত ছিল।

নতুন পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেছে একদম কাকতালীয়ভাবে। ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান, অ্যান আরবার সহ বেশ কিছু দল যখন এপিথিলিয়াল (ত্বক বা গাত্রবেষ্টনী) কোষ তৈরি করছিল, তখন তাদের অর্গানয়েডগুলো হঠাৎ করে এমন কিছু কোষ তৈরি করে ফেলল, যেগুলো সাধারণত রক্তনালীর প্রাচীর গঠনে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের কোষ সাধারণত “দূষণ” বা অপ্রয়োজনীয় ধরে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু মিশিগানের গবেষকরা এটিকে কাজে লাগাতে intestinal (অন্ত্র) অর্গানয়েডে এই কোষগুলোর পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

এ সুযোগ কাজে লাগান চীনের বেইজিং-এ ইনস্টিটিউট অফ জুলজির স্টেম-সেল জীববিজ্ঞানী ইয়িফেই মিয়াও এবং তার দল। তারা পরীক্ষা করেন, একই ডিশে এপিথিলিয়াল কোষ ও রক্তনালীর কোষ একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে গঠন করা সম্ভব কি না—lung এবং gut অর্গানয়েড দিয়ে শুরু করেন।

তবে সমস্যা হলো, প্রথমিক বিকাশপর্বে এই দুই ধরনের কোষ গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় সম্পূর্ণ বিপরীত রাসায়নিক সংকেত। “তুমি একটিকে বাঁচাতে পারো, অন্যটি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবে,” বলছেন মিয়াও। তবে তিনি ও তার সহকর্মীরা বিশেষ এক কৌশলে রাসায়নিক সংকেতের

টাইমিং এমনভাবে দেন, যাতে স্টেম সেল থেকে দুটি কোষই গঠিত হয় একসঙ্গে।

হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস

ফলাফল অত্যন্ত আশাজাগানিয়া। মাউসের দেহে প্রতিস্থাপিত lung organoid গুলো alveoli (গ্যাস বিনিময়ের থলির মতো গঠন) সহ বিভিন্ন ধরণের কোষে পরিণত হয়। কোষগুলোকে থ্রিডি স্ক্যাফোল্ডে বসানো হলে তারা নিজ থেকে alveolar sac-এর মতো কাঠামো গঠন করে, যা ইঙ্গিত দেয় রক্তনালী কোষ থাকায় অর্গানয়েডগুলো আরও জটিল ও বহুধরনের কোষ তৈরি করতে পেরেছে। “এটা আমার কাছে সত্যিই আকর্ষণীয় মনে হয়েছে,” বলছেন জার্মানির ব্রাউনশোয়াইগ-এর হেলমহোলৎস সেন্টারের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার জোসেফ পেনিনগার। একই পদ্ধতিতে তাঁরা রক্তনালীবিশিষ্ট অন্ত্র অর্গানয়েডও তৈরি করেছেন।

অন্যদিকে অ্যাবিলেজ একই কৌশলে প্লেটে ক্ষুদ্র হৃদপিণ্ড তৈরি করেন, যেখানে পেশী, রক্তনালী ও এমনকি স্নায়ুকোষও দেখা গেছে। রক্তনালীগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়ে অন্যান্য কোষে প্রবেশ করেছে, যা প্রাথমিক হৃদযন্ত্রে পাওয়া যায়। একই পদ্ধতিতে তৈরি লিভার অর্গানয়েডেও জটিল রক্তনালীর ডালপালা গঠিত হয়েছে।

তবে এই অর্গানয়েডগুলো এখনও শুধুমাত্র গর্ভাবস্থার প্রাথমিক বিকাশ পর্যায়ের গঠন অনুকরণ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত, পেনিনগার বলেন, অর্গানয়ের প্রকৃত কার্যকারিতা অর্জনের জন্য ‘অ্যাসেমব্লয়েড’ ও কো-গ্রোথ দুই ধরনের পদ্ধতি একত্র করতে হবে। এজন্য শুধু সূক্ষ্ম রক্তনালী নয়, এর সাথে সহায়ক টিস্যু, গঠন এবং এমনকি লসিকা তন্ত্রের (lymphatic system) নালীও তৈরি করতে হবে, যা তরল প্রবাহ ও কোষীয় বর্জ্য অপসারণে কাজ করে। আর একবার রক্তনালী তৈরি হয়ে গেলে, পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হবে সেই নালীর মাধ্যমে আসল রক্ত প্রবাহ করানো — অর্থাৎ ‘নলচালু’ করা। পেনিনগার বলেন, এটা “একটা দারুণ রোমাঞ্চকর ক্ষেত্র”।

লেখক: সাদিয়া আনাম ইসরা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1126/science.adu9375, 10.1016/j.cell.2025.05.041*

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

পুরোনো দাঁতের প্রোটিনে লুকানো ইতিহাস

গবেষকরা কেনিয়া থেকে প্রাপ্ত দাঁতের জীবাশ্ম থেকে ১৮ মিলিয়ন বছরের পুরনো প্রোটিন শনাক্ত করেছেন। এই আবিষ্কার পূর্বপুরুষ স্তন্যপায়ীদের বিবর্তন ও সম্পর্ক বোঝার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ীর বিবর্তন বুঝতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কেবল হাড় বা দাঁতের আকৃতির ওপর নির্ভর করে এসেছি। কিন্তু এবার বিজ্ঞানীরা এমন এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন, যা দাঁতের গভীরে লুকানো প্রোটিন বিশ্লেষণ করে কোটি বছর আগের প্রাণীদের সম্পর্ক ও পরিবেশের তথ্য তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এক গবেষণায়, কেনিয়ার তুর্কানা উপত্যকার দাঁতের এনামেল (emamel) বা বাইরের শক্ত স্তর থেকে বিজ্ঞানীরা প্রাচীন প্রোটিনের খণ্ডাংশ উদ্ধার করেছেন যা ১৮ মিলিয়ন বছর পুরনো রাইনোসোর দাঁতে সংরক্ষিত ছিল। শুধু তাই নয়, ৯ জুলাই, ২০২৫ এ Nature জার্নালে প্রকাশিত তাদের গবেষণাপত্রে প্লাইস্টোসিন যুগ (১.৫ মিলিয়ন বছর) থেকে শুরু করে ওলিগোসিন (২৯ মিলিয়ন বছর) পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর দাঁতের প্রোটিন খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কীভাবে পাওয়া গেল এত পুরনো প্রোটিন?

জীবাশ্ম দাঁতের ভেতরকার এনামেল টিস্যু একধরনের ঘন, খনিজে পরিপূর্ণ স্তর যা প্রোটিনকে দেহাবশেষে আটকে রাখতে সক্ষম। গবেষকরা “ডায়াজেনেটিফর্ম” নামক পরিবর্তিত প্রোটিনের অংশ বিশ্লেষণ করে শনাক্ত করেছেন যে কোনটা আসলেই জীবাশ্ম থেকে এসেছে এবং কোনটা আধুনিক দূষণের ফলে যুক্ত হয়েছে।

তাঁরা এমনকি দাঁতে রাসায়নিক পরিবর্তনের চিহ্নও শনাক্ত করেছেন, যেমন কারবামাইলেশন, অক্সিডেশন, ডিমাইডেশন এবং গ্লাইকেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়া পরিবর্তন। এইসব পরিবর্তন শুধু প্রাচীনতার প্রমাণই নয়, বরং দাঁতের এনামেলে সংরক্ষিত সবচেয়ে পুরনো এডভান্সড গ্লাইকেশন প্রোডাক্টের (AGEs) উপস্থিতির নজিরও স্থাপন করেছে।

কী জানাচ্ছে এই প্রোটিন?

বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে দাঁতের প্রোটিনগুলো বর্তমান স্তন্যপায়ীদের নির্দিষ্ট শ্রেণির সাথে মিল রয়েছে। যেমন, ১৮ মিলিয়ন বছর আগের রাইনোসরের দাঁতের প্রোটিন আজকের গণ্ডার ও ট্যাপির সঙ্গে মিল খায়। তেমনি ৭ মিলিয়ন বছরের পুরনো জলহস্তীর (হিপোপটামাস) প্রোটিনের সাথে আধুনিক জলহস্তী ও তিমির মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

এছাড়াও, একটি ১৬ মিলিয়ন বছরের প্রোবোসিডিয়ান (হাতির প্রাচীন পূর্বপুরুষ) দাঁতের প্রোটিনের সঙ্গে আজকের হাতির মিল পাওয়া গেছে, যা বৈজ্ঞানিকদের জন্য বিশাল এক বিজয়। এই মিলের মাধ্যমে তাঁরা দাঁতের প্রোটিন ব্যবহার করে একটি প্রোটিন-ভিত্তিক বিবর্তনীয় গাছ (phylogenetic tree) নির্মাণ করেছেন, যা পূর্বে কেবল DNA দিয়ে সম্ভব ছিল।

এই গবেষণা দেখিয়ে দিল যে আফ্রিকার গরম, ট্রপিকাল অঞ্চলেও (যেখানে DNA দ্রুত নষ্ট হয়) দাঁতের এনামেল প্রোটিন বহু মিলিয়ন বছর টিকে থাকতে পারে। এর ফলে আমাদের সামনে খুলে যেতে পারে প্লিওসিন-যুগের আগের প্রজাতিগুলোর বিবর্তন বোঝার নতুন দরজা।

এখন প্রশ্ন উঠছে, আমরা কী দাঁতের প্রোটিন বিশ্লেষণ করে ডাইনোসরের যুগ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে দাঁত হতে পারে বিবর্তনের এক নতুন টাইম মেশিন।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09040-9*

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

বরফে ২৪ মিলিয়ন বছরের পুরনো দাঁতের প্রোটিন

কানাডার আর্কটিক অঞ্চল থেকে বিজ্ঞানীরা ২৪ মিলিয়ন বছর পুরনো গণ্ডারের জীবাশ্ম দাঁত থেকে প্রোটিন উদ্ধার করেছেন। এই গবেষণা গণ্ডার পরিবারের বিবর্তনে নতুন মোড় এনেছে এবং প্রোটিন সংরক্ষণের জন্য ঠান্ডা অঞ্চলগুলোর সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

Beth Zaiken

প্রাকৃতিক ইতিহাসের রহস্য উন্মোচনে এবার এক ধাপ এগিয়ে গেল বিজ্ঞান। সম্প্রতি কানাডার আর্কটিকে আবিষ্কৃত একটি গণ্ডারের দাঁত থেকে বিজ্ঞানীরা উদ্ধার করেছেন প্রায় ২৪ মিলিয়ন বছর পুরনো প্রোটিন যা এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম স্তন্যপায়ী এনামেল প্রোটিন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কার শুধুমাত্র প্রাচীন প্রোটিন সংরক্ষণের সম্ভাবনা বাড়ায়নি, বরং গণ্ডার পরিবারের (Rhinocerotidae) বিবর্তন নিয়েও নতুন আলোকপাত করেছে। গবেষণাপত্রটি গত ৯ জুলাই, ২০২৫ এ Nature এ প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে কানাডার উত্তরাঞ্চলের হটন ক্রেটার থেকে সংগৃহীত জীবাশ্ম ব্যবহার করে। ওই এলাকায় বর্তমানে চরম শীতপ্রবণ পরিবেশ থাকলেও মায়োসিন যুগে (২১–২৪ মিলিয়ন বছর আগে) অঞ্চলটি ছিল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ (গড় তাপমাত্রা ৮–১২°C)। আর সেই পরিবেশেই গঠিত হয় এক ধরনের প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, যেখানে দাঁতের এনামেল স্তরে আটকে ছিল প্রোটিনের অণু।

গবেষকরা বিশেষ ল্যাব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাঁতের এনামেল থেকে ৭টি প্রোটিনের অংশবিশেষ উদ্ধার করেন—যার মধ্যে রয়েছে AMELX (Amelogenin), ENAM (Enamelin), AMBN (Ameloblastin) ইত্যাদি। প্রায় ১,১৬৩টি স্পেকট্রাম ম্যাচ এবং ২৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড সাইট শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এই গণ্ডারটি আজকের Rhinocerotinae (যেমন: কালো বা সাদা গণ্ডার) কিংবা Elasmotheriinae (যেমন: সাইবেরিয়ান ইউনিকর্ন)–এর পূর্বপুরুষ হলেও, এই দুই গোষ্ঠীর পূর্ববর্তী এক প্রাচীন শাখায় অবস্থান করত। অর্থাৎ, এটি একটি আরও প্রাচীন গণ্ডার বংশের প্রতিনিধি, যার কারণে গণ্ডার বিবর্তনের টাইমলাইন পুনরায় লিখতে হতে পারে।

আগের ধারণা ছিল *Elasmotheriinae* ও Rhinocerotinae-এর মধ্যে বিভাজন ঘটেছিল প্রায় ৪৭ মিলিয়ন বছর আগে, কিন্তু এই গবেষণা বলছে সেটি আসলে হয়েছিল মাত্র ৩৪–২২ মিলিয়ন বছর আগে, যা পূর্ব অনুমানের তুলনায় অনেকটা সাম্প্রতিক।

এই গবেষণার মাধ্যমে গবেষকরা এক নতুন ধারণা দিচ্ছেন—"Proteomic Lagerstätte"। সাধারণ Fossil Lagerstätte বলতে বোঝায় এমন স্থান যেখানে জীবাশ্ম খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু হটন ক্রেটারের ক্ষেত্রে দাঁতের প্রোটিন অণুগুলো এতটা ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল যে বিজ্ঞানীরা এখন এটিকে জৈব-আণবিক স্তরের Lagerstätte হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন।

এছাড়া গবেষণায় ব্যবহৃত thermal age modeling প্রমাণ করেছে যে শীতল অঞ্চলে দাঁতের প্রোটিন হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষিত থাকতে পারে। এতে বোঝা যায়, শুধুমাত্র DNA-নির্ভর নয়, প্রোটিন-নির্ভর বিবর্তন চিত্রও বহু পুরনো জীবাশ্ম বিশ্লেষণে কার্যকর হতে পারে।

এই গবেষণা দেখিয়ে দিল যে আর্টিক অঞ্চলের হিমায়িত মৃত্তিকা কেবল হাড় বা দাঁতের আকৃতি নয়, বরং জীববিজ্ঞানের জৈব অণু সংরক্ষণেও সক্ষম। ফলে এই অঞ্চল থেকে আরও গভীর সময়ের প্রোটিন উদ্ধার সম্ভব হতে পারে—এমনকি ডাইনোসর যুগেরও!

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে যদি Aceratheriinae (হর্নলেস প্রাচীন গণ্ডার) এবং অন্যান্য প্রজাতির দাঁত বিশ্লেষণ করা যায়, তবে গণ্ডার পরিবারের পুরো বিবর্তন ইতিহাসের একটা আণবিক টাইমলাইন তৈরি করা সম্ভব হবে।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41586-025-09231-4

লেপটন

ATLAS ডিটেক্টরটি লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের একটি অংশ, যা সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের সীমানায় অবস্থিত একটি পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে স্থাপন করা আছে। এই ডিটেক্টরটি লেপ্টন ও অন্যান্য মৌলিক কণার খোঁজ করে (Kim Steele/Getty Images)

লেপটন হলো এক ধরনের মৌলিক কণা।

একটি কণাকে তখনই মৌলিক ধরা হয়, যখন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে সেটি আর কোনো ছোট কণার সমন্বয়ে গঠিত নয়। লেপটন ছাড়াও অন্যান্য মৌলিক কণার মধ্যে কোয়ার্ক ও বোসন রয়েছে।

লেপটনের ছয়টি ধরন বা "ফ্লেভার" আছে (হ্যাঁ, পদার্থবিজ্ঞানীরা সত্যিই এই শব্দটাই ব্যবহার করেন!)। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো ইলেকট্রন। অন্য দুটি হলো মিউওন ও টাউওন। বাকি তিনটি হলো নিউট্রিনোর ফ্লেভার: ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো এবং টাউ নিউট্রিনো। এদের ভাবা যেতে পারে তিন প্রধান লেপটনের 'নিউট্রিনো সংস্করণ' হিসেবে।

দুইটি বৈশিষ্ট্য লেপটনদের অন্য মৌলিক কণা (যেমন কোয়ার্ক বা বোসন) থেকে আলাদা করে তোলে।

প্রথমটি হলো স্ট্রং ফোর্স বা শক্তিশালী পারমাণবিক বল। এটি প্রকৃতির চারটি মৌলিক বল (gravitational, electromagnetic, strong, weak)-এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, যদিও এটি খুব ছোট দূরত্বে কাজ করে। এই বলই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকা প্রোটন ও নিউট্রনকে একসাথে আটকে রাখে। আরও গভীরে গেলে, কোয়ার্ক নামক ক্ষুদ্র কণাগুলো এই স্ট্রং ফোর্সে বাঁধা অবস্থায় থাকে, যার মাধ্যমে গঠিত হয় প্রোটন ও নিউট্রনের মতো হ্যাড্রন কণা।

কিন্তু লেপটনদের ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন। লেপটনরা এই স্ট্রং ফোর্সের প্রভাব অনুভব করে না। এর মানে, তারা কোয়ার্কদের মতো স্ট্রং ফোর্স দ্বারা একত্র হয়ে জটিল গঠন তৈরি করতে পারে না। ফলে, তারা কখনো হ্যাড্রনের মতো শক্তভাবে বাঁধা কণারূপে পরিণত হয় না।

যদি কোনো পরিস্থিতিতে লেপটনরা একসাথে জটিল গঠন তৈরি করে, তবে সেটি হবে স্ট্রং ফোর্সের বদলে অন্য কোনো মৌলিক বলের কারণে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো স্পিন। "স্পিন" হলো সাবঅ্যাটমিক কণাগুলোর একটি গভীর ও রহস্যময় কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য। যদিও নামটি শুনে ঘূর্ণনের ধারণা আসতে পারে, তবে বাস্তবিক অর্থে এটি ক্লাসিকাল ঘূর্ণনের মতো কিছু নয়। বরং একটি অন্তর্নিহিত কোয়ান্টাম সংখ্যা, যা কণার আচরণ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে।

সব লেপটনেরই একরকম স্পিন থাকে যাকে ½ (half-integer spin) বলা হয়। এই স্পিন সংখ্যা তাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে ফার্মিয়ন (fermion) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করে। এই শ্রেণির কণাগুলো পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপল বা পাউলির বর্জন নীতি (একই কোয়ান্টাম অবস্থানে একাধিক

ফার্মিয়ন থাকতে পারে না) মানে। ফার্মিয়নকে ভর বহনকারী কণাও বলা হয়।

এদিকে কোয়ার্কের স্পিনও অর্ধ-পূর্ণসংখ্যা, ফলে সেগুলোও ফার্মিয়ন। কিন্তু বোজোন নামক অন্য এক শ্রেণির মৌলিক কণার স্পিন পূর্ণসংখ্যা (যেমন 0, 1, 2)। তারা একে অপরের সঙ্গে একই কোয়ান্টাম অবস্থান ভাগ করে নিতে পারে, এটাই তাদের মৌলিক পার্থক্য।

স্পিন শুধু শ্রেণীবিন্যাসেই সীমাবদ্ধ নয় — এটি নির্ধারণ করে একটি কণা কীভাবে পদার্থ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্রিয়া দেখাবে। উদাহরণস্বরূপ, ইলেকট্রনের স্পিনই ইলেকট্রনের চৌম্বক ধর্ম (magnetic moment) নির্ধারণ করে, যার ফলেই কাজ করে এমআরআই মেশিনের মতো প্রযুক্তি।

এই দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, লেপটনের ছয়টি ফ্লেভারের মধ্যে রয়েছে চোখে পড়ার মতো পার্থক্য। কেউ কেউ তুলনামূলকভাবে হালকা, আবার কেউ কেউ অত্যন্ত ভারী। উদাহরণস্বরূপ, একটি মাত্র টাউ কণা একটি ইলেকট্রনের তুলনায় ৩,০০০ গুণ বেশি ভারী! অথচ এই কণাটিও ইলেকট্রনের মতোই এক ধরনের লেপটন।

এছাড়াও, লেপটনের মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জ থাকা বা না থাকার ভিত্তিতেও বড় পার্থক্য দেখা যায়। ইলেকট্রন, মিউওন এবং টাউ, এই তিনটি লেপটনেরই ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ রয়েছে। অন্যদিকে, তিন ধরনের নিউট্রিনোই সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ।

এই চার্জহীনতা নিউট্রিনোদের জন্য এক বিশিষ্ট সুবিধা এনে দেয়। তারা সহজেই যে কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রায় বাধাহীনভাবে চলে যেতে পারে। আমাদের শরীর, মাটি, এমনকি গোটা পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে তারা প্রায় বিনা বাধায় অতিক্রম করতে পারে। প্রতিনিয়ত কোটি কোটি নিউট্রিনো আমাদের দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, অথচ আমরা কিছুই টের পাচ্ছি না।

নিউট্রিনোদের এই "অদৃশ্য উপস্থিতি" এবং চরম ক্ষীণ ক্রিয়াশীলতা তাদেরকে বিজ্ঞানের অন্যতম রহস্যময় কণায় পরিণত করেছে। এই কারণে নিউট্রিনো শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল। কিন্তু উচ্চ-শক্তির এই লেপটনদের ধরতে পারলে মহাবিশ্বের বহু অজানা তথ্য উন্মোচিত হতে পারে।

আশার কথা হলো, বিজ্ঞানীরা এখন বনভূমি, বরফময় অঞ্চল, এমনকি সমুদ্রের গভীরে নিউট্রিনো শনাক্ত করার যন্ত্রপাতি বসাচ্ছেন। তারা বিশ্বাস করেন, এসব প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার করে নিউট্রিনোর দুর্লভ উপস্থিতি ধরা সম্ভব হবে। কারণ যখন নিউট্রিনো কোনো পারমাণবিক কণার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তা থেকে জন্ম নিতে পারে একটি ছোট্ট আলো বা তরঙ্গ আর বিজ্ঞানীরা ঠিক সেগুলোরই খোঁজ করছেন।

লেখক: সুমাইয়া আক্তার রিয়া

সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞানবার্তা

@bigganbartafb @bigganbarta @bigganbarta @bigganbarta

জীববিজ্ঞান

প্রাণীর বিষে ৩৮৬টি সম্ভাব্য অ্যান্টিবায়োটিক

গবেষকরা সাপ, মাকড়সা, বিচ্ছু সহ বিভিন্ন প্রাণীর বিষ বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ৩৮৬টি নতুন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড চিহ্নিত করেছেন, যেগুলোর বেশিরভাগই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর। ইঁদুরে পরীক্ষায় এই বিষ-উৎসজাত পেপটাইডগুলো সংক্রমণ কমাতে সক্ষম হয়েছে কোনো উল্লেখযোগ্য বিষক্রিয়া ছাড়াই।

Fahroni/Shutterstock.com

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বিশ্বজুড়ে একটি মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মানবসভ্যতাকে। প্রতিবছর প্রায় ৫০ লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন এমন সংক্রমণে, যেখানে প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না। কিন্তু এবার গবেষকেরা আশার আলো দেখেছেন এমন এক উৎসে, যা যুগ যুগ ধরে ভয় ও রহস্যে মোড়া—জন্তুদের বিষ!

আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং গণনা-ভিত্তিক জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের নানা প্রাণীর বিষ থেকে খুঁজে বের করেছেন নতুন ধরনের ৩৮৬টি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড। এই প্রোটিন-সদৃশ অণুগুলোর বেশিরভাগই আগে কখনো শনাক্ত করা হয়নি। গবেষকরা এটিকে বলেছেন “Venom-encrypted peptides” বা VEPs। গবেষণাপত্রটি গত ১২ জুলাই, ২০২৫ এ *Nature Communications* জার্নালে প্রকাশিত হয়।

গবেষণার প্রাথমিক ধাপে তাঁরা প্রায় ১.৬ লাখ বিষ-প্রোটিন বিশ্লেষণ করে কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতিতে ৪ কোটি ৬০ লাখের বেশি সম্ভাব্য পেপটাইড চিহ্নিত করেন। তারপর তাদের তৈরি করা APEX নামের AI মডেল ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়। সেখান থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৫৮টি পেপটাইড বাস্তব পরীক্ষায় পাঠানো হয়। তার মধ্যে ৫৩টি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

বিশেষ করে মাকড়সা-ভিত্তিক ডেটাবেজ আরাকনোসারভার (ArachnoServer) থেকে সংগৃহীত পেপটাইডগুলো শতভাগ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। পেপটাইডগুলো ব্যাকটেরিয়ার সেল মেমব্রেনের বৈদ্যুতিক ভারসাম্য ভেঙে দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়। এদের কাজ করার ধরণ অনেকটা প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইডের মতো, তবে তাদের গঠন ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

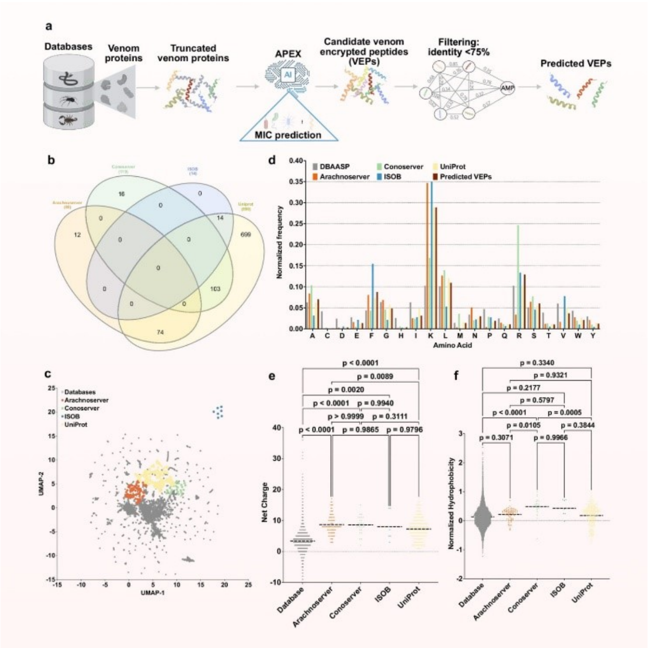

Guan et al./Nature Communications

গবেষকরা এই পেপটাইডগুলোর কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তারা পানিতে কিছুটা অগোছালো অবস্থায় থাকে, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার মতো পরিবেশে পৌঁছালে নিজেকে মোচড় দিয়ে α-helix গঠন নেয়, যেটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী এক পদ্ধতি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই গবেষণায় কিছু পেপটাইডকে ইঁদুরে ত্বকের সংক্রমণে প্রয়োগ করে দেখা হয়, এবং তারা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে কোনোরকম বিষক্রিয়া ছাড়াই। বিশেষ করে Arachnoserver-5 নামের পেপটাইডটি *A. baumannii* নামক এক ভয়ংকর ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে তিনদিনে তিন-লগ ইউনিট পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া কমিয়ে দিয়েছে।

“প্রাথমিকভাবে ৫৮টি পেপটাইড পরীক্ষায় পাঠানো হয়। তার মধ্যে ৫৩টি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।”

তবে গবেষকেরা স্বীকার করেছেন, এই পেপটাইডগুলোর কিছুতে এখনও কোষের প্রতি বিষাক্ততা আছে, বিশেষ করে মানব কিডনি কোষের ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতে পেপটাইডগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ও গঠনগত সূক্ষ্মতা বাড়িয়ে কার্যকারিতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়াও কমানো হবে।

গবেষণাটির এক গবেষণা ড. চ্যাংগে গুয়ান বলেন, “আমাদের দল এখন সেরা পেপটাইড ক্যান্ডিডেট নিয়ে কাজ করছে, যেগুলো থেকে আরো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হতে পারে, এবং আমরা সেগুলোকে ওষুধ-রসায়নভিত্তিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।”

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41467-025-60051-6*

অণুজীববিজ্ঞান

ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া ক্যান্সার চিকিৎসার দিগন্ত বদলে দিতে পারে!

মানব অন্ত্রে থাকা Hominenteromicrobium mulieris ব্যাকটেরিয়া ইমিউন থেরাপির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সক্ষম বলে ইঁদুরের উপর গবেষণায় দেখা গেছে। এখন এই ব্যাকটেরিয়া-ভিত্তিক চিকিৎসা মানুষের ওপর পরীক্ষার পথে।

মানবদেহের অন্ত্রের গভীরে বাস করে একপ্রকার নিরীহ ও কম পরিচিত ব্যাকটেরিয়া হল *Hominenteromicrobium mulieris*। কিন্তু এই নিরীহ প্রাণীই এখন ক্যান্সার চিকিৎসার জগতে নতুন আশার আলো হয়ে উঠছে। জাপানের ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টারের ইমিউনোলজিস্ট হিরোইওশি নিশিকাওয়া ও তার সহকর্মীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, এই ব্যাকটেরিয়ার একটি নির্দিষ্ট স্ট্রেইন (YB328) ইমিউন থেরাপি, বিশেষ করে PD-1 ব্লকেড নামক ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধের কার্যকারিতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে, অন্তত ইঁদুরের ওপর পরীক্ষায় তা দেখা গেছে। এ বিষয়ক গবেষণাপত্রটি গত ১৪ জুলাই, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, *H. mulieris* অন্ত্রে বসবাসকারী ডেনড্রাইটিক কোষ (dendritic cells) নামক ইমিউন কোষকে সক্রিয় করে তোলে। এই কোষগুলো রক্তের মাধ্যমে টিউমার অঞ্চলে পৌঁছে গিয়ে সেখানে CD8+ T কোষ নামের “হত্যাকারী কোষ” সক্রিয় করে, যারা ক্যান্সার

কোষ শনাক্ত করে ও ধ্বংস করে। PD-1 ব্লকেড ওষুধ T কোষগুলোর উপর থাকা ব্রেকস তুলে দিয়ে তাদের আরও কার্যকর করে তোলে, আর *H. mulieris* সেই T কোষকে শক্তিশালী করার পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

Steve Gschmeissner/Science Photo Library

প্রথমে গবেষকেরা ৫০ জন ক্যান্সার রোগীর মল থেকে ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করেন, যাদের কেউ কেউ ইমিউন চেকপয়েন্ট ইনহিবিটর (immune checkpoint inhibitor) থেরাপিতে ভালো সাড়া দিয়েছিলেন। তাদের নমুনা ইঁদুরে প্রতিস্থাপন করে দেখা যায়, সফল রোগীদের নমুনা দেওয়া ইঁদুরেরা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বেশি প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

এরপর তারা দীর্ঘ দেড় বছরের চেষ্টায় শনাক্ত করেন YB328 নামক স্ট্রেইনটিকে, যেটি মূলত এই পার্থক্যের জন্য দায়ী। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই স্ট্রেইন শুধুমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে না, বরং এটি অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর।

গবেষকেরা ইতিমধ্যে একটি বায়োটেক কোম্পানির সাথে যৌথভাবে ক্লিনিকাল ট্রায়াল শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। লক্ষ্য, মানুষে এই ব্যাকটেরিয়া-ভিত্তিক চিকিৎসার কার্যকারিতা যাচাই করা। যদি সফল হয়, তবে এটি হবে এমন একটি উদ্ভাবন যা ব্যয়বহুল ও সীমিত পরিসরের ইমিউনোথেরাপিকে আরও কার্যকর ও ব্যাপক করতে পারে।

পূর্ববর্তী এক গবেষণায় দেখা গেছে যে কিছু অন্যান্য অণুজীবও চেকপয়েন্ট ইনহিবিটরের থেরাপির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। নতুন গবেষণায় গবেষকেরা সেই জীবাণুগুলোকেও পরীক্ষা করেন, তবে তারা দেখেন যে সেগুলোর কার্যকারিতা *H. mulieris* ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় অনেক কম।

গবেষণার এই আবিষ্কার মানবদেহে থাকা মাইক্রোবায়োমের সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এটি প্রমাণ করে, আমাদের দেহের অভ্যন্তরেই লুকিয়ে থাকতে পারে রোগ প্রতিরোধের চাবিকাঠি। বিজ্ঞানীরা এখন স্বপ্ন দেখছেন — কেবল ওষুধ নয়, অন্ত্রের বন্ধুবান্ধবরাও ভবিষ্যতের ক্যান্সার যোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: অরুণিমা তানহা

রেফারেন্স: *DOI: [10.1038/s41586-025-09249-8](https://doi.org/10.1038/s41586-025-09249-8)*

জুলাই মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

সুত্র: নেচার

পার্টি অ্যানিম্যাল

অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে তোলা এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক ইস্টার্ন কোয়োল (*Dasyurus viverrinus*), যা প্রথমবারের মতো বন্য অবস্থায় আল্ট্রাভায়োলেট আলোতে জ্বলে ওঠা এক মারসুপিয়াল প্রাণী হিসেবে ধরা পড়েছে। দৃশ্যমান আলোতে এর লোম বাদামি বা কালো, সাদা দাগযুক্ত, কিন্তু UV আলো শোষণ করে তা ভিন্ন তরঙ্গে নির্গত হলে নীলাভ আভা ছড়ায়। ফটোগ্রাফার বেন অ্যালড্রিজের তোলা এই ছবিটি বিকার স্ট্রিট সায়েন্স ফটোগ্রাফি প্রাইজ ২০২৫-এর ফাইনালিস্ট তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

Ben Alldridge

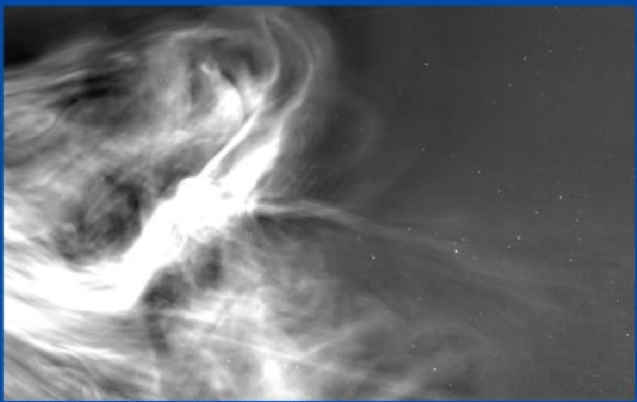

NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Lab

সূর্যের কাছাকাছি

নাসার পার্কার সোলার প্রোব সূর্যের মাত্র ৬.১ মিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কাছের ছবি তুলেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মতো ঘূর্ণায়মান সোলার উইন্ড, যা সূর্যের বাইরের স্তর থেকে নির্গত বৈদ্যুতিক কণার স্রোত। পৃথিবীতে এই সৌর বাতাসের কারণেই অরোরা বা উত্তর-দক্ষিণ মেরুর আলো দেখা যায়। কখনো দ্রুতগামী হলে এগুলো ভূ-চৌম্বকীয় ঝড়ও তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই কাছ থেকে তোলা দৃশ্য তাদের সোলার উইন্ড ও পৃথিবীর ওপর এর প্রভাব আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

ফ্যাশনেবল সায়েন্স

প্যারিস হাউট কৌচার উইক (Paris Haute Couture Week) ডিজাইনার আইরিস ভ্যান হারপেন তার শো "Sympoiesis"-এ বিজ্ঞানের ছোঁয়াযুক্ত পোশাক প্রদর্শন করেছেন। বায়োডিজাইনার ক্রিস্টোফার বেলামির সঙ্গে মিলে তিনি এমন পোশাক বানিয়েছেন যাতে জীবন্ত বায়োলুমিনেসেন্ট শৈবাল বসানো আছে। এগুলো শরীরের তাপ ও নড়াচড়ায় প্রতিক্রিয়া জানায়। নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে তার অ্যাটেলিয়েতে অর্গানজা, টিউল থেকে শুরু করে ৩ডি প্রিন্টেড ফিল্ম ব্যবহার করে পোশাক তৈরি হয়, যেখানে সাদা কোট পরা সহকারীদের একটি দলও কাজ করে।

Gio Staiano

Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty

সাইবর্গ জেলিফিশ

গভীর সমুদ্র অন্বেষণে একদিন সহায়ক হতে পারে এই অদ্ভুত জেলিফিশ-রোবট হাইব্রিড। প্রাণীর শরীরে স্থাপন করা হয়েছে ইলেকট্রোড, যা বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠিয়ে পেশীর সংকোচন ঘটায় এবং তাদের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এতে আছে তাপমাত্রা ও প্রেসার সেন্সর, এমনকি ডেটা সংরক্ষণের জন্য একটি এসডি কার্ডও। যেহেতু জেলিফিশের কোনো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা ব্যথা-গ্রাহী রিসেপ্টর নেই এবং তাদের পুনর্জন্ম ক্ষমতা প্রবল, তাই এ ধরনের রিমোট-কন্ট্রোলড সাইবর্গ হিসেবে তারা উপযুক্ত। গবেষকরা ভবিষ্যতে এর নকশায় উন্নতি এনে গভীর সমুদ্রে নামানোর পরিকল্পনা করছেন।

মহাকাশে স্প্রাইট

অ্যাস্ট্রোনট নিকোল আয়ার্স আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে তুলেছেন এই বিস্ময়কর ছবি, যেখানে দেখা যাচ্ছে স্প্রাইট নামক একটি বিরল আলোক ঝলকানি। বজ্রপাতের কয়েক মুহূর্ত পর, পৃথিবীর প্রায় ৮০ কিলোমিটার ওপরে বজ্রঝড়ের উপরের স্তরে এই সংক্ষিপ্ত আলোক ঝলক দেখা দেয়। এটি ঘটে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত বজ্রপাতের মিথস্ক্রিয়ার ফলে। গবেষকেরা খতিয়ে দেখছেন, জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে স্প্রাইটের ঘটনার হার ও তীব্রতাকে প্রভাবিত করছে।

Nichole Ayers/NASA/Handout via Reuters

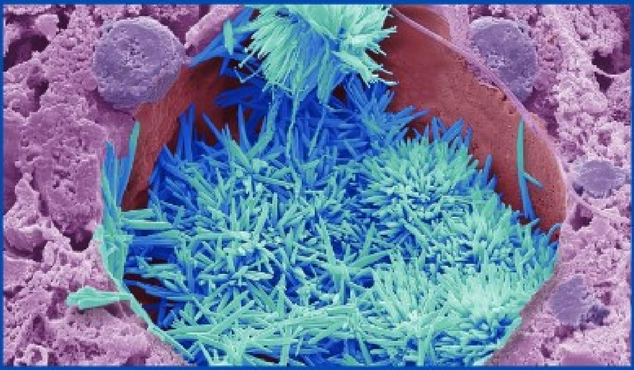

Steve Gschmeissner

কোলেস্টেরল স্ফটিক

বেগুনি রঙে দেখানো এই লিভার সেলে নীলচে কোলেস্টেরল স্ফটিক জমেছে, যা রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত করে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। স্টিভ গশমাইজনার নামের বৈজ্ঞানিক ফটোগ্রাফার এটি স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তুলেছেন, যেখানে মাত্র ১২ মাইক্রোমিটার আকারের গঠনকেও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেখা সম্ভব। এই ছবি ওয়েলকাম ফটোগ্রাফি প্রাইজ ২০২৫-এর বিজয়ী হয়েছে।

হারানো শহর

পেরুর লিমা শহরের ২০০ কিলোমিটার উত্তরে পাওয়া গেছে ৩,৫০০ বছরের পুরোনো একটি নগরী, নাম পেনিকো। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেখানে ১৮টি স্থাপনা খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে আছে ধর্মীয় মন্দির ও আবাসিক এলাকা। ধারণা করা হচ্ছে, এটি ছিল এমন এক বাণিজ্যকেন্দ্র, যা দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ও আন্দেস পর্বতমালাকে সংযুক্ত করেছিল। এ আবিষ্কার গবেষকদের কারাল সভ্যতার ইতিহাস আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

Ernesto Benavides/AFP/Getty

Amir Cohen/Reuters

শব্দে ভীত পোকা

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, গাছের তৈরি শব্দে প্রতিক্রিয়া জানায় প্রজাপতি ও মথ। যখন টমেটো গাছ আঘাত পায়, তখন তারা আল্ট্রাসনিক শব্দ ছাড়ে (যা মানুষের শোনা যায় না, কিন্তু প্রাণীরা টের পায়)। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মথেরা ডিম পাড়তে শব্দহীন গাছকেই বেছে নেয়। সম্ভবত তারা ধরে নেয়, যে গাছ সবচেয়ে সুস্থ, সেটাই তাদের শূককীটদের জন্য ভালো খাদ্যের উৎস হবে।

স্ক্রুওয়ার্ম শনাক্তকারী কুকুর

হাভানা নামের দুই বছরের এক জার্মান শেফার্ড কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে স্ক্রুওয়ার্ম মাছি শনাক্ত করতে। এই মাছি গরুর শরীরে পরজীবী হয়ে মাংস খায় এবং মেক্সিকোতে গবাদি পশুর জন্য বড় হুমকি তৈরি করেছে। দেশটির জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থা আশ্রয় থেকে উদ্ধার করা কয়েকটি কুকুরকে এ কাজে প্রশিক্ষিত করেছে। তারা সাধারণত আট বছর কাজ করে, বা বয়স দশ হলে অবসরে যায় এবং অনেক সময় প্রশিক্ষকদের কাছেই দত্তক নেয়া হয়। প্রতিদিন ডজন ডজন স্ক্রুওয়ার্ম আক্রান্ত গরু শনাক্ত করা হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর স্ক্রুওয়ার্ম আক্রান্ত গরু শনাক্ত করা হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পশুপালন বাণিজ্যকেও প্রভাবিত করছে।

Raquel Cunha/Reuters

Maria D. Guillén/IPHES-CERCA

প্রাচীন আঘাত

স্পেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় Roc de les Orenetes প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে পাওয়া গেছে ৪,০০০ বছরের পুরোনো মানবপাঁজর, যেখানে এখনো একটি তীরের মাথা আটকে আছে। গবেষকেরা মনে করছেন, তীরটি পিছন থেকে ছোঁড়া হয়েছিল, তবে তা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়নি—কারণ হাড় তীরের চারপাশে সেরে উঠেছে। এ আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয়, ব্রোঞ্জ যুগের শুরুর দিকে পিরিনিজ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সহিংসতা বিদ্যমান ছিল। গবেষকেরা এক্স-রে, রাসায়নিক ও ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই সমাজ সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করবেন।

বিজ্ঞানজগতের সর্বশেষ

সংবাদ

পেয়ে যান আপনার হাতের মুঠোয়

আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন

WWW.BIGGANBARTA.ORG

বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা

Kristina Armitage/Quanta Magazine/ChatGPT

ডায়ার নেকড়ে বা 'ভয়াল নেকড়ে' ছিল বিশালদেহী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী, যাদের আকৃতি ছিল প্রায় ছোট একটি ঘোড়ার মতো। তারা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে একজন মানুষের হাত ছিঁড়ে ফেলতে পারত ঠিক যেমন এক কুকুর ইঁদুর মারতে পারে। এরা বাস করত ঠান্ডা অঞ্চলগুলোতে, এক জায়গার নাম ছিল ওয়েস্টেরস... ওহ, দুঃখিত! আমি বোধহয় গেম অব থ্রোনস টিভি সিরিজের কল্পিত ডায়ার নেকড়েদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।

বাস্তবে যেসব ডায়ার নেকড়ে পৃথিবীতে বাস করত, তারা আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় ধূসর নেকড়েদের চেয়ে বড় ছিল না, তবে গড়ন ছিল আরও মজবুত, দাঁতগুলো বড় এবং তাদের পিনাস বোন (baculum) ছিল বেশ বড় আকৃতির। ধারণা করা হয়, তারা তখনকার সময়ের জায়ান্ট গ্রাউন্ড স্লথ (এখন বিলুপ্ত) এর মতো মেগাফনা প্রাণীর মাংস খেত। হাজার হাজার বছর টিকে থাকার পর, তারা আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু এবছরের এপ্রিলের প্রথম দিক থেকেই শোনা যাচ্ছে যে, তারা আবার ফিরে এসেছে। অন্তত, Colossal Biosciences নামের একটি কোম্পানি দাবি করছে যে ডায়ার নেকড়েই প্রথম প্রাণী যাকে "মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে" আনা হয়েছে। আমরা এপ্রিল মাসে বিজ্ঞানবার্তা-য় এই নিয়ে সংবাদ এবং সমালোচনা প্রকাশও করেছি। তবে এটি একমাত্র প্রাণী নয়, যাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। ডোডো, উলি ম্যামথ, প্যাসেঞ্জার পিজন, মোয়া এবং আরও অনেক বিলুপ্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই রকম পরিকল্পনা চলছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আদৌ কি এটি সম্ভব? বিলুপ্ত প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনা কি বিজ্ঞানসম্মত? শুধু হারিয়ে যাওয়া প্রাণীকে সামনে থেকে দেখার রোমাঞ্চ ছাড়াও, এর পেছনে আসলে

কী বৈজ্ঞানিক বা পরিবেশগত যৌক্তিকতা আছে? আর কেনই বা Colossal-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে?

কলসাল বায়োসায়েন্সেস এর তৈরি "ডায়ার উলফ" এ একটি, ১৫ দিন বয়সে (Colossal Biosciences)

বিলুপ্ত প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনার ইতিহাস

এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে থেকেই বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে আনার ধারণা চালু আছে। ১৯২০-এর দশকে জার্মানিতে প্রথম এমনই এক চেষ্টা হয়েছিল। জার্মান প্রাণীবিদ লুৎজ হেক (Lutz Heck) এবং হাইঞ্জ হেক (Heinz Heck) বিলুপ্ত বন্য গরু Aurochs-কে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এর জন্য তারা গৃহপালিত গরুর নির্বাচিত প্রজনন (ক্রসব্রিডিং) করা শুরু করেছিলেন, যেহেতু ধারণা ছিল গৃহপালনের ফলে গরু দুর্বল হয়ে পড়েছে। শেষমেশ যে প্রাণী তৈরি হয়, তা দেখতে Aurochs-এর মতো হলেও, তা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের।

১৯৮০-এর দশকে একই রকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল এক প্রকার সাদা-কালো ডোরাকাটা বিলুপ্ত জেব্রার উপ-প্রজাতি কোয়াগা (Quagga) ফিরিয়ে আনার জন্য। জেব্রাদের নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল কোয়াগার মতো দেখতে কিছু নমুনা, যাদের পেছনের অংশে ডোরা ছিল না।

কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লডিও সিলেরো এ ব্যাপারে বলন, "আপনি এটাকে কোয়াগা দাবি করতে পারেন না। কারণ, নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে যে প্রাণী বানানো যায়, তা দেখতে হয়তো কোয়াগার মতো, কিন্তু জেনেটিকভাবে একেবারেই আলাদা।"

তবে এখন, শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রজননের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। যদি আমরা কোনো বিলুপ্ত প্রাণীর ডিএনএ খুঁজে পেয়ে তা জীবিত কোষে প্রবেশ করিয়ে ক্লোন তৈরি করতে পারি, তবে?

এ ধারণাই মানুষের কল্পনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল ১৯৯৩ সালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র জুরাসিক পার্ক-এ। যদিও বিজ্ঞানী সমাজে "de-extinction" বা বিলুপ্ত প্রজাতি পুনরুজ্জীবনের কোনো নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে এটি মানে হলো, হারিয়ে যাওয়া প্রাণীর হুবহু কপি তৈরি করা। কিন্তু বাস্তবে কি তা সম্ভব?

IUCN বা International Union for Conservation of Nature ২০১৬ সালের একটি রিপোর্টে বলেছে, "বর্তমানে বিদ্যমান কোনো পদ্ধতি দিয়ে একটি বিলুপ্ত প্রজাতির নিখুঁত কপি তৈরি করা সম্ভব নয়, কারণ তাতে জেনেটিক, এপিজেনেটিক, আচরণগত ও শারীরবৃত্তীয় নানা ভিন্নতা থেকেই যাবে।"

ডি-এক্সটিঙ্কশন মানে আসলে কী?

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী টম গিলবার্ট বলেন, "এটা আসলে সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে। যদি কেউ বলে যে, ডি-এক্সটিঙ্কশন মানে হলো জিনগতভাবে হুবহু বিলুপ্ত প্রাণীকে ফিরিয়ে আনা, তাহলে সেটা সম্ভবত অসম্ভবই।" কারণ, বেশিরভাগ বিলুপ্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জিনোম উদ্ধার করার উপায় নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিএনএ ভেঙে পড়ে, আর ফাঁকা জায়গা থেকে যায়।

তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে, বিশেষ করে যেসব প্রাণী সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়েছে এবং যাদের ক্রায়োপ্রিজার্ভড (তুষার-সংরক্ষিত) কোষ এখনো আছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে মার্কিন সংস্থা Revive & Restore ১৯৮৮ সালে মৃত একটি ব্ল্যাক-ফুটেড ফেরেট-এর সংরক্ষিত কোষ ব্যবহার করে তিনটি জীবন্ত ফেরেট ক্লোন তৈরি করে। তারা সংরক্ষিত কোষ থেকে সম্পূর্ণ ডিএনএ একটি ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপন করে এই কাজটি করে।

Revive & Restore-এর গবেষক বেন নোভাক বলেন, "এটা হচ্ছে আসল পুনরুজ্জীবন। আমরা একটি বিপন্ন প্রজাতির হারিয়ে যাওয়া জিনভ্যারিয়েন্ট ফিরিয়ে এনেছি।"

তবে এটাকে প্রকৃত অর্থে ডি-এক্সটিঙ্কশন বলা যায় না, কারণ ব্ল্যাক-ফুটেড ফেরেট পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। ২-৩ বার বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলেও এক সময় তাদের সংখ্যা মাত্র সাতটি ফেরেটে নেমে এসেছিল। সেক্ষেত্রে, একটিমাত্র অ-আত্মীয় ফেরেট ক্লোন করেও জেনেটিক বৈচিত্র্য অনেক বাড়ানো গেছে, যা এই প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে।

এধরনের ক্লোনিং ব্যবহার করে পুরোপুরি বিলুপ্ত কিছু প্রজাতিকেও ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে। যেমন, বুকার্ডো নামের এক ধরনের মাউন্টেইন ছাগলের শেষটি মারা যায় ২০০০ সালে, একটি গাছের নিচে চাপা পড়ে। তার কোষ সংরক্ষণ করে ২০০৩ সালে একটি ক্লোন করা হয়। কিন্তু সেটি মাত্র ১০ মিনিট বেঁচেছিল, সম্ভবত ক্লোনিং-সম্পর্কিত স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণে।

এটাই ছিল প্রকৃত ডি-এক্সটিঙ্কশনের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রচেষ্টা। তবে সেই ক্লোনটি পুরোপুরি বুকার্ডো ছিল না। এর ডিএনএ-র সামান্য অংশ ডিম্বাণু দাতার মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে এসেছে। আর পুরুষ বুকার্ডোর অনুপস্থিতিতে Y ক্রোমোজোম ছিল না, ফলে একটি বিশুদ্ধ প্রজনন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

আরও কিছু বিলুপ্ত প্রজাতির ক্রায়োপ্রিজার্ভড নমুনা আমাদের আছে। যেমন অদ্ভুত গ্যাস্ট্রিক-ব্রুডিং ব্যাঙ *Rheobatrachus silus* এবং *Rheobatrachus vitellinus*। এরা নিজেদের পেটের ভিতরে ডিম ফোটাতো। ১৯৭০-এর দশকে কুইন্সল্যান্ডে এই ব্যাঙ আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এখনো পর্যন্ত এদের ক্লোনিংয়ে কোনো সফলতা আসেনি।

যেসব প্রাণীর সংরক্ষিত কোষ নেই, সেক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা হাড়, দাঁত, কিংবা পারমাফ্রোস্টে পাওয়া জমাট মাংসের ডিএনএ। যেমন, গত বছর Colossal দাবি করেছে, তারা একটি দাঁত থেকে অস্ট্রেলিয়ান কার্নিভোরাস মারসুপিয়াল থাইলাসিন (যাকে তাসমানিয়ান টাইগার-ও বলা হয়) এর প্রায় সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্স উদ্ধার করতে পেরেছে।

আমরা এখনো সেই কম্পিউটারভিত্তিক সিকোয়েন্স থেকে জীবন্ত কোষে বাস্তব ডিএনএ তৈরি করতে পারি না, তবে ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে।

ডাইনোসর পুনরুজ্জীবন?

সময় যত গড়ায়, ডিএনএ ততটাই ভেঙে পড়ে। ফলে কোনো প্রাণী যত আগে বিলুপ্ত হয়েছে, তার জিনগত উপাদান (DNA) ততটাই খণ্ডিত হয়ে পড়ে। এর মানে হলো, যেসব প্রাণী এক শতাব্দীরও বেশি আগে বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের হুবহু ক্লোন তৈরি করা একেবারেই সম্ভব নয়। এদিকে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন যে ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট সিকোয়েন্স করতে পেরেছেন, তাও মাত্র ২০ লাখ বছর পুরোনো! সুতরাং, দুঃখিত গায়েজ, ডাইনোসরকে ফিরিয়ে আনার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা শুধু এটাই নয় যে, আমরা তাদের ফিরিয়ে আনতে পারবো কিনা, বরং এটাও ভাবা দরকার যে — আমাদের আদৌ এমন চেষ্টা করা উচিত কি না। কারণ, এই প্রাণীরা যেসব পরিবেশে বাস করতো, সেসব বাস্তুতন্ত্র বহু আগেই হারিয়ে গেছে।

এইরকম নৈতিক ও বাস্তব সমস্যা ২০১৬ সালের IUCN রিপোর্ট-এ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, কোনো একটি প্রাণী ফিরিয়ে আনা উচিত কেবল তখনই, যদি তা পরিবেশ সংরক্ষণে বাস্তব কোনো উপকারিতা বয়ে আনে — যেমন কোনো বাস্তুতন্ত্রে সেই প্রাণীর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলে।

এই দৃষ্টিকোণে দেখা গেলে, ফিরিয়ে আনা প্রাণীটি হুবহু আগের মতো না হলেও চলে — যদি তা প্রায় একই ইকোলজিক্যাল কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানী সমাজে একে বলা হয় "creating a proxy of an extinct species for conservation benefit" — অর্থাৎ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিলুপ্ত প্রাণীর বিকল্প তৈরি করা। অনেক জীববিজ্ঞানী যখন "de-extinction" শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তারা এই বিকল্প ধারণাটিই বোঝান। তবে, এটি একেবারে আলাদা বিষয় জুরাসিক পার্ক-ধাঁচের হুবহু ডাইনোসর বানানোর ধারণার তুলনায়।

আসলে, অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমানে জীবিত প্রজাতিগুলোই যথেষ্ট ভালো বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে। নিউজিল্যান্ডের অটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী ফিলিপ সেডন (যিনি ২০১৬ সালের IUCN রিপোর্ট তৈরিতে সহায়তা করেছিলেন) বলেন, "আমরা জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিকল্প

খুঁজতে গেলে, আগে জীবিত প্রজাতিগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।”

ফ্রান্সের পন্ট ডি'আর্ক গুহায় অবস্থিত উলি ম্যামথের একটি মডেল (Jean-Marc Zaorski/Gamma-Rapho/Getty Images)

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে — সংরক্ষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ডি-এক্সটিঙ্কশন প্রকল্পগুলো কি যথার্থ?

ধরা যাক, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একধরনের বুনো গরু Aurochs এর কথা। জার্মানির Auerrind Project-এর গবেষক ক্লাউস ক্রুপ বলেন, “এমন বড় তৃণভোজী প্রাণীরা প্রকৃতিতে বিশাল প্রভাব ফেলে।

তারা যে বিপুল পরিমাণ মল ফেলে, তা বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝে চেইন-রিঅ্যাকশন সৃষ্টি করে। এছাড়া, কাদামাটিতে তাদের খোঁড়ানো খুরের গভীর ছাপ হয়ে ওঠে ব্যাঙের মতো প্রাণীদের জন্য আবাসস্থল।”

অরোকস ফিরিয়ে আনা

১৯২০-এর দশকে গৃহপালিত গরুর প্রজননের মাধ্যমে যেসব Aurochs-সদৃশ প্রাণী বানানো হয়েছিল, তারা Aurochs-এর অর্ধেক আকৃতিরও না। তাই Auerrind Project আবার নতুনভাবে এই প্রাণী ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে, তবে এবার তাদের হাতে প্রাচীন Aurochs-এর আংশিক জিনোম সিকোয়েন্স আছে, যা লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়ক। একইরকম প্রকল্প চলছে নেদারল্যান্ডস-এও।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, আধুনিক বড় গরুর জাতগুলোকেই কি এ কাজে ব্যবহার করা যায় না? ক্রুপ বলেন, “আজকের বেশিরভাগ গরু সারা বছর বাইরের প্রকৃতিতে বাঁচার মতো উপযোগী নয়। তাদের মধ্যে Aurochs-এর মতো সামনে মুখ করে থাকা শিংও নেই, যা শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করত।”

তাঁর বক্তব্য, “আমরা এই গরু ব্যবহার করতে চাই এমন অঞ্চলে, যেখানে নেকড়ে থাকে। তাই আমরা চাই, তাদের টিকে থাকার সর্বোচ্চ সুযোগ দিতে।”

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে বিলুপ্ত প্যাসেঞ্জার পিজন পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা চলছে (mashuk/iStock)

Revive & Restore-এর আরও একটি পরিকল্পনা হলো, এমন একটি পাখি তৈরি করা, যার আচরণ হবে একদা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্যাসেঞ্জার পিজন (passenger pigeon)-এর মতো। এজন্য তারা এর সবচেয়ে কাছের জীবিত আত্মীয় — band-tailed pigeon-কে জিনগতভাবে পরিবর্তন করে এমন আচরণ তৈরির চেষ্টা করছে।

বেন নোভাক বলেন, যেসময়ে প্যাসেঞ্জার পিজন বিলুপ্ত হয়নি, সেসময় তারা বিশাল ঝাঁকে গাছের ডালে বসবাস করত এবং নিচে জমিয়ে রাখত ইঞ্চি পরিমাণ গুয়ানো (পাখির বিষ্ঠা)। ধারণা করা হয়, এই ধরনের পরিবেশগত ব্যাঘাত বনজ পরিবেশের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং জীববৈচিত্র্য বাড়াতে সহায়ক ছিল।

তিনি বলেন, “আজকের দিনে (যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে) অনেক বন আছে বটে, কিন্তু সেই বনগুলোর গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা আগামী ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে উইসকনসিনে একটি বনে গুয়ানো ছড়িয়ে একটা পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করব, যেটা আমরা কয়েক বছর ধরে বিশ্লেষণ করব।”

নোভাক আরও বলেন, তাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২০০ কোটি প্যাসেঞ্জার পিজন-সদৃশ পাখি বসবাস করার মতো বনভূমি রয়েছে। যদিও এত বিশাল সংখ্যার পাখির ঝাঁক মানুষের পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে বিশাল কারিগরি চ্যালেঞ্জ পেরিয়ে। কারণ পাখিদের ডিমের কুসুম (yolk) একটি বিশাল কোষ, যার মধ্যে ডিএনএ কোথায় আছে তা আবিষ্কার করা এখনো সম্ভব হয়নি। ফলে, Colossal-এরও এই একই সমস্যায় পড়তে হবে, তারা যেহেতু ৮ জুলাই, ২০২৫ এ ঘোষণা দিয়েছে যে নিউজিল্যান্ডের বিশালাকার, উড়তে না পারা Moa পাখি ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এছাড়া, band-tailed এবং passenger pigeon-এর জিনোমের মধ্যে ২৫ মিলিয়ন জেনেটিক পার্থক্য রয়েছে! তবে নোভাক আশা করেন, মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য হয়তো শুধু কয়েক হাজার পরিবর্তনই যথেষ্ট হবে।

তারা যেটা করতে চাইছে, তা হলো band-tailed pigeon-এর জেনোমের বড় অংশগুলো পরিবর্তন করে সেখানে passenger pigeon-এর ডিএনএ ঢুকিয়ে দেওয়া। যেসব জিনগুলোর আচরণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলোকেই বেছে নেওয়া হবে। কিন্তু আশা করা হচ্ছে, ওই জিনের আশেপাশে থাকা অনেকগুলো উপাদানও আচরণগত গঠনে সহায়ক হবে। নোভাক বলেন "আমরা জানি না প্রতিটি মিউটেশন কী করে। তাই আমাদের ভাবনা হলো, বেশি করে ঢুকিয়ে দাও! আমরা যদি ১২টি বড় জিনের পরিবর্তন করি, যেগুলোর প্রতিটিই ১ লাখ বেস পেয়ার, তাহলে একসঙ্গে দশ হাজারেরও বেশি জিনগত পরিবর্তন হয়ে যাবে।"

এই প্রকল্প যদি সফল হয়, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি হবে একটি সংকর প্রজাতি যা band-tailed pigeon (*Patagioenas fasciata*) এবং passenger pigeon (*Ectopistes migratorius*)-এর মিশ্রণ। তাই নোভাক প্রস্তাব দিয়েছেন নতুন এই প্রজাতির নাম হবে: *Patagioenas neoectopistes* অর্থাৎ, "আমেরিকার নতুন ঘুরে বেড়ানো পায়রা"।

যদিও Revive & Restore অনেক সময় বলে বসে যে তারা "passenger pigeon ফিরিয়ে আনছে", কিন্তু Novak স্পষ্ট করে বলেন, "আমরা মূল passenger pigeon ফিরিয়ে আনতে পারবো না। ওটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

ডায়ার নেকড়ে ফিরে এলো? মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম?

Colossal Biosciences-এর ডায়ার নেকড়ে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা তুলনামূলকভাবে অনেক কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ডায়ার নেকড়ে ও ধূসর নেকড়ের (grey wolf) জিনোমের মধ্যে মিলিয়নেরও বেশি পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এই প্রকল্পে তারা ধূসর নেকড়ের জিনে মাত্র ২০টি ছোট পরিবর্তন এনেছে, যার মধ্যে মাত্র ১৫টি পরিবর্তনই ডায়ার নেকড়েের জিনোম থেকে নেওয়া।

এই পরিবর্তিত কোষগুলো দিয়ে ক্লোনিং করে জন্ম দেওয়া হয়েছে তিনটি জিন-সম্পাদিত ধূসর নেকড়ে।

এই ২০টি জিনগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাণীগুলোকে আরও বড় ও পেশীবহুল করা, তাদের লোমকে দীর্ঘ ও সাদা করে তোলা, ঠিক যেমন Game of Thrones-এর ডায়ার নেকড়েদের মতো (*Colossal-এর ৭ এপ্রিল, ২০২৫ -এর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই টিভি সিরিজের নাম তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে*)।

Colossal-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বেথ শ্যাপিরো বলেন, "এই তিনটি নেকড়ে পুরোপুরি বড় না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না, জিনগত পরিবর্তন কতটা সফল হয়েছে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তাদের বয়স বাড়া পর্যন্ত, যেন প্রয়োজনীয় স্ক্যান করতে পারি।"

তবে নোভাক যেভাবে পায়রাগুলোকে "সংকর" বা হাইব্রিড হিসেবে বর্ণনা করার পরিকল্পনা করছেন, Colossal সেই পথে হাঁটছে না। বরং তারা দাবি করছে, "এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই আমরা ডায়ার নেকড়ে ফিরিয়ে এনেছি। শুরু থেকেই আমরা 'কার্যকর ডি-এক্সটিঙ্কশন'-এর ধারণা ব্যবহার করছি এবং Colossal সেটাই অর্জন করেছে।"

কিন্তু বাস্তবে এই তিনটি জিন-সম্পাদিত নেকড়ে না তো ডায়ার নেকড়ের সঠিক জিনগত অনুরূপ, না তারা ডায়ার নেকড়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাণী।

তাদের ধূসর নেকড়ের ইকোলজিক্যাল ভূমিকার চেয়ে আলাদা কিছু করার প্রমাণও নেই। ধরে নিলাম যে তারা করতে পারতো কিন্তু সমস্যা হলো, এখন আর বাইসনের চেয়ে বড় কোনো মেগাফনা নেই, তাই তাদের জন্য কোনো প্রাকৃতিক

ইকোলজিক্যাল ফাঁকও নেই। ফিরিয়ে আনার নৈতিক যৌক্তিকতাও নেই।

তদুপরি, Colossal-এর এই জিন-সম্পাদিত নেকড়েগুলিকে প্রকৃতিতে ছাড়ার কোনো পরিকল্পনাই নেই। কারণ, তারা সাধারণ ধূসর নেকড়েদের সঙ্গে প্রজনন করে জিনগতভাবে মিশে যেতে পারে যা বড় এক জেনেটিক ঝুঁকি।

IUCN-এর কানিড (কুকুর-জাতীয় প্রাণী) বিশেষজ্ঞরা এক বিবৃতিতে সোজাসাপটা বলেছে, "Colossal-এর তৈরি তিনটি প্রাণী ডায়ার নেকড়ে নয়। এমনকি তারা ডায়ার নেকড়ের বিকল্পও নয়।"

নোভাক যেভাবে পায়রার জিনোমে বড় অংশ অদলবদল করার কথা বলছেন, Colossal চাইলে সেভাবে আরও বেশি অংশ ডায়ার নেকড়ের জিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করে ডায়ার নেকড়ের মতো দেখতে সংকর প্রাণী তৈরি করতে পারত। প্রয়োজনে আরও বেশি জিনগত পরিবর্তন এনে, ধূসর নেকড়ের চেয়ে ডায়ার নেকড়ের কাছাকাছি কিছু বানানো সম্ভব হতো।

কিন্তু যেহেতু Colossal আগে থেকেই দাবি করেছে — "আমরা ডায়ার নেকড়ে ফিরিয়ে এনেছি" তাই তারা সম্ভবত সেই দিকে আর আগাবে না।

উলি ম্যমথকে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা

Colossal-এর উলি ম্যামথ ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনাও অনেকটা একইরকম। তারা হাতিকে জিনগতভাবে পরিবর্তন করে একটা ম্যামথ-সদৃশ প্রাণী তৈরি করতে চায়। এখানেও যা হবে তা হলো, হাতি ও ম্যামথের একটি সংকর প্রাণী, যা বাস্তবে ম্যামথ নয় বরং ম্যামথের তুলনায় অনেক বেশি হাতির মতোই থাকবে।

আর প্রশ্ন উঠছে, আদৌ এমন প্রাণীর প্রয়োজন আছে কি?

এই ধরনের প্রকল্পের পক্ষে অনেকেই এমনটা বলেন যে, বড় তৃণভোজী প্রাণীরা আর্কটিক অঞ্চলের পারমাফ্রোস্ট গলে যাওয়া ধীর করতে সাহায্য করতে পারে। আসলে, এক ক্ষুদ্র গবেষণায় দেখা গেছে, বড় প্রাণীরা যখন তুষার চেপে সমতল করে, তখন তুষার আর ঘন কম্বলের মতো কাজ করে না, ফলে মাটির নিচটা ঠান্ডা থাকে।

কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড গ্রেনিয়ার বলছেন যে এই কাজ তো ঘোড়াও করতে পারে। "ভালো গবেষণা প্রমাণ করে, এর জন্য ম্যামথের দরকার নেই। এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পরিমাণগত স্কেল। জলবায়ু পরিবর্তনে প্রকৃত প্রভাব ফেলতে যে পরিমাণ ভূমির দরকার, তা এত বিশাল যে, কোনো সংরক্ষণ প্রকল্পে তা আগে কখনো দেখা যায়নি।"

সংবাদ

জ্যোতির্বিজ্ঞান

তাহলে Colossal-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? একটি লাভজনক বেসরকারি কোম্পানি হিসেবে Colossal কেন এত প্রচেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করছে ডি-এক্সটিঙ্কশন-এ? তারা এই বিশাল খরচের বিনিময়ে আয় করবে কীভাবে? গ্রেনিয়ার মনে করেন, ডি-এক্সটিঙ্কশন প্রকল্প থেকে সরাসরি মুনাফা করা কঠিন। তিনি মনে করেন, এই প্রকল্পগুলোর মূল লক্ষ্য আসলে বিলুপ্ত প্রাণী ফিরিয়ে আনা নয়, বরং নতুন জিন-সম্পাদনা প্রযুক্তি তৈরি ও প্রদর্শন করা এবং সেটা থেকে অর্থ উপার্জন। তাঁর বক্তব্য, "এটা কোনো সত্যিকারের ডি-এক্সটিঙ্কশন ব্যবসা নয়। তারা পুরো কোনো প্রাণীকে সত্যিকারের 'মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে' আনবে না কারণ ওটাই তো তাদের কাজ না।"

Colossal অবশ্য তাদের দাবিতে অনড়। তারা বলছে, তারা ইতিমধ্যেই সেটা করেছে।

তবে তারা তাদের ব্যবসায়িক ব্যাপার গোপন রাখেনি Colossal। বরং, তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের লক্ষ্য এই গবেষণার স্পিন-অফ প্রয়োগ থেকে লাভ করা। তাদের গবেষণায় IVF (ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন), ঔষধ আবিষ্কার, রিজেনারেটিভ মেডিসিন (আবার নতুন টিস্যু তৈরি করা), এমনকি জেনেটিক ইনহ্যান্সমেন্ট (জিনগত উন্নয়ন)-এ অগ্রগতি ঘটাতে পারে।

শ্যাপিরো বলেন, "আমাদের ১৭ সদস্যের একটি দল পুরোপুরি কৃত্রিম জরায়ু তৈরি করার কাজ করছে, যেটার বহুমুখী প্রয়োগ হতে পারে।"

একটা ব্যাপারে সব জীববিজ্ঞানীই একমত যে, Colossal নতুন জেনেটিক প্রযুক্তিতে বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করছে।

তবে, আপনি যদি ভাবেন যে আমরা Jurassic Park-এর বাস্তব রূপ দেখতে চলেছি। তাহলে সিনেপ্লেক্সে চলমান Jurassic World Rebirth মুভিটা এখনো সবচেয়ে ভালো অপশন!

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ

LIGO পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষ শনাক্ত করেছে। এই আবিষ্কার শুধু মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিজ্ঞানে নয়, মহাকাশ নিয়ে আমাদের সব ভাবনাকেই নাড়িয়ে দিয়েছে।

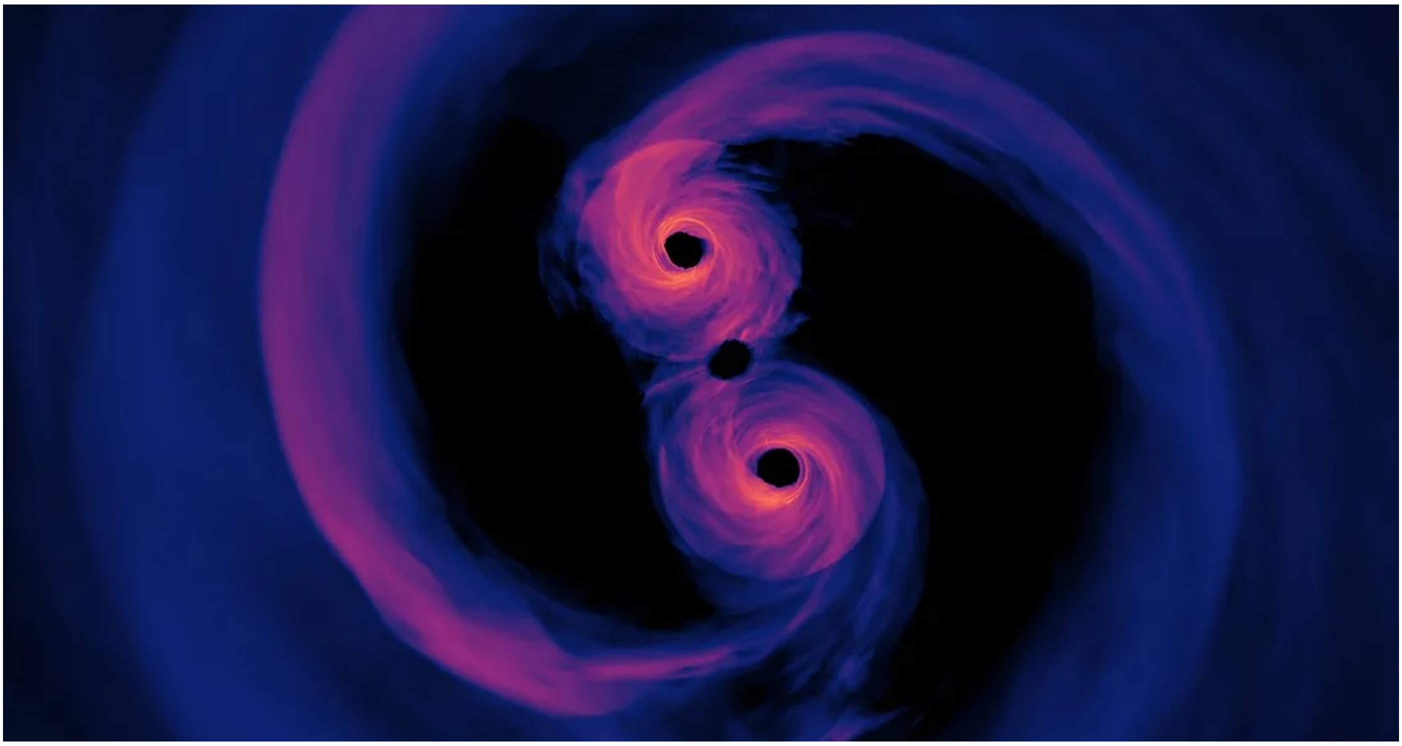

NASA's Goddard Space Flight Center

মহাবিশ্বের রহস্যময় ও ভয়ংকর বস্তুদের মধ্যে আমাদের জানার পরিধি আরও একধাপ বাড়িয়ে দিল একটি নতুন আবিষ্কার। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ইতিহাসে ধরা পড়া সবচেয়ে বড় ব্ল্যাকহোল (black hole) সংঘর্ষের সংকেত পেয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজারভেটরি (LIGO) নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (gravitational wave) শনাক্ত করে। খুবই সাধারণভাবে বললে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হলো সময় ও স্থানের ভাঁজে সৃষ্টি হওয়া সূক্ষ্ম তরঙ্গ। এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তখন, যখন দুটি ব্ল্যাকহোল বা নিউট্রন স্টারের মতো বিশাল ও ভীষণ ভারী কোনো বস্তুর সংঘর্ষ হয় বা একে অপরকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে একীভূত হয়। এই গবেষণাগারটি ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে গত ১০ বছরে প্রায় ১০০টির মতো ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ শনাক্ত করেছে। কিন্তু ২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর তারা যে সংকেতটি ধরেছিল, তা ছিল অসাধারণ এবং প্রথমে গবেষকদের কাছে একধরনের ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষক সোফি বিনি জানান, পরে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সেটি ছিল ইতিহাসে ধরা পড়া সবচেয়ে বিশাল ব্ল্যাক হোল সংঘর্ষের ফল। একটির ওজন ছিল সূর্যের চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি, আর অপরটি প্রায় ১৪০ গুণ। আগে পাওয়া সবচেয়ে বড় সংঘর্ষও এর অর্ধেকের কাছাকাছি ছিল মাত্র।

এই দুটি কৃষ্ণগহ্বর শুধু বিশালই ছিল না, তারা ঘূর্ণনেও ছিল অত্যন্ত দ্রুত — এতটাই যে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাবিশ্বের যে গাণিতিক মডেল আমরা এখন পর্যন্ত তৈরি করেছি, তার সীমার কাছাকাছি এরা।

কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মার্ক হ্যানাম বলেন, এতো ভারী ব্ল্যাকহোল সাধারণত কোনও নক্ষত্রের ধ্বংসে সরাসরি সৃষ্টি হয় না। তার মতে, সম্ভবত ছোট কৃষ্ণগহ্বরগুলোর একাধিক বার সংঘর্ষ ও একীভবনের ফলে এমন দৈত্যাকার কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয়েছে।

ইতালির মিলানো-বিকোক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডাভিদে জেরোসা বলেন, “১০ বছর আগে আমরা অবাক হয়েছিলাম

যখন ৩০ সূর্য ভরের ব্ল্যাক হোল পেয়েছিলাম। আর এখন ১০০-এর বেশি ভরের ব্ল্যাক হোল দেখা যাচ্ছে, এটা এক কথায় অসাধারণ।”

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের বিশাল এবং দ্রুত ঘূর্ণমান কৃষ্ণগহ্বর থেকে আসা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়, তাই সেগুলো শনাক্ত করাও কঠিন।

এই গবেষণার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ১৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ১৬ তম এদোয়ার্দো আমালদি কনফারেন্স অন গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস।

হ্যানাম ও বিনি দুজনই মনে করেন, এমন সংকেতের উৎস ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে আরও অনেক এ ধরনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। লিগোর প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে প্রতিবারই নতুন নতুন ঘটনা শনাক্ত করা যাচ্ছে। তবে একটা চিন্তার বিষয়ও আছে, মার্কিন ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি লিগো-এর একটি অংশ বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে এমন সংকেত শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে হ্যানামের আশঙ্কা।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

রেফারেন্স: *DOI: 10.48550/arXiv.2507.08219*

পদার্থবিজ্ঞান

১৬৫ বছর পুরোনো তাপ বিকিরণ সূত্রের শেষ!

১৬৫ বছর আগের কিরশফের তাপ বিকিরণ সূত্রকে চ্যালেঞ্জ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এমন এক পদার্থ উদ্ভাবন করেছেন, যা চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে তাপ শোষণ ও নির্গমনের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি করতে পারে। এটি ভবিষ্যতের সৌর শক্তি, সেন্সর ও তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

বিজ্ঞানী গুস্টাফ কিরশফ ১৮৬০ সালে এক ঐতিহাসিক সূত্র প্রস্তাব করেছিলেন। তার সূত্র বলে, একটি পদার্থ যতটা তাপ শোষণ করে, ঠিক ততটাই নির্গত করে। এই সূত্র (যেটিকে আমরা কিরশফের তাপ বিকিরণ সূত্র হিসেবে জানি) বিগত দেড় শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তাপগতিবিদ্যার একটি ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক সম্প্রতি এমন এক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা এই সূত্রের মূলে আঘাত হেনেছে এবং সেটাও অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে।

এই যুগান্তকারী গবেষণার একজন গবেষক হলেন বাংলাদেশের প্রমিত ঘোষ, যিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক শেষ করে বর্তমানে পেন স্টেটে পিএইচডি করছেন।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, একটি বিশেষভাবে তৈরি পাতলা পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এমনভাবে তাপ বিকিরণ করতে পারে যাতে তার নির্গত এবং শোষিত তাপের পরিমাণের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। গবেষকদের মতে, এটি কিরশফের সূত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম যা আগের সব গবেষণাকে ছাপিয়ে গেছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পদার্থবিজ্ঞান জার্নাল *Physical Review Letters*-এ।

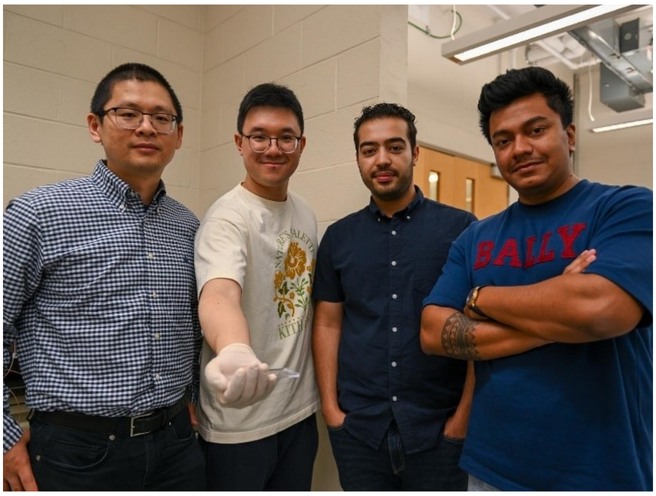

একই ফ্রেমে গবেষণাটির গবেষণা (বাম থেকে ডানে) লিনক্সিয়াও ঝু, ঝেনং ঝাং, আলিরেজা কালান্তারি দেহাঘি এবং প্রমিত ঘোষ (Caleb Craig/Penn State)

গবেষকরা একটি “গ্রেডিয়েন্ট-ডোপড” ইনডিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (InGaAs) নামক আধা-পরিবাহী পদার্থের পাঁচটি স্তর নিয়ে গঠিত এক বিশেষ পাতলা ফিল্ম তৈরি করেন। প্রতিটি স্তরের বৈদ্যুতিক ধর্ম ভিন্নভাবে সাজানো হয়

যাতে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাপ বিকিরণের অনুরণন সৃষ্টি হয়। এই ফিল্মটি একটি স্বর্ণপাতের ওপর স্থাপন করা হয় এবং এর পুরুত্ব ছিল মাত্র দুই মাইক্রোমিটার—একটি মানুষের চুল থেকেও পাতলা।

গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষভাবে তৈরি করা একটি যন্ত্র: Angle-Resolved Magnetic Thermal Emission Spectrophotometer (ARMTES)। এই যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষকরা একটি নির্দিষ্ট কোণে এবং ±৫ টেসলা পর্যন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে বিভিন্ন কোণ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পদার্থের তাপ নির্গমন এবং শোষণের পার্থক্য নিরূপণ করেন।

ফলাফল ছিল চমকপ্রদ। গবেষকরা প্রমাণ করেন যে, নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কোণে, পদার্থটির নির্গমনের ক্ষমতা শোষণের ক্ষমতার চেয়ে ৪৩% বেশি হতে পারে। এত বড় মাত্রার "nonreciprocity" বা অ-প্রতিসমতা এর আগে কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি। পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলো ছিল মাত্র ১২ থেকে ২২ শতাংশের মধ্যে এবং অনেক কম তরঙ্গব্যাপ্তিতে সীমাবদ্ধ।

গবেষকদের মতে, এই আবিষ্কার প্রযুক্তিগতভাবে বিপ্লব ঘটাতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। যেমন:

১. সৌর কোষ (Solar Cells): প্রচলিত সৌর কোষ থেকে কিছু তাপ ফেরত চলে যায় সূর্যের দিকে, যেটি একধরনের শক্তির অপচয়। কিন্তু এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্গমনকে ভিন্ন দিকে চালিত করা সম্ভব, ফলে সেই শক্তিও ধরা যাবে।

২. তাপীয় সেন্সর ও ইনফ্রারেড ক্যামোফ্লাজ: সেন্সরের সংবেদনশীলতা এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বহুগুণে বাড়বে।

৩. নির্বাহী তাপ প্রবাহ (Heat Flux Control): ভবিষ্যতের তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

৪. থার্মোফোটোভোল্টাইক ও রেডিয়েটিভ কুলিং-এও এই প্রযুক্তি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

এই গবেষণায় প্রমিত ঘোষ-এর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়। বৈশ্বিক গবেষণায় বাঙালি তরুণদের এমন অংশগ্রহণ দেশের বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়।

১৬৫ বছরের পুরনো একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রকে শক্তভাবে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে গবেষকরা একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, যা ভবিষ্যতের শক্তি প্রযুক্তি ও তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মুখ বদলে দিতে পারে।

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

রেফারেন্স: *DOI: 10.1103/PhysRevLett.135.016901*

স্বাস্থ্য

অপিওয়েড শনাক্তকরণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন

গবেষকেরা একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা আঙুলের একফোঁটা রক্ত বা নবজাতকের ড্রাই ব্লাড স্পট থেকেই মাত্র কয়েক মিনিটে ছয় ধরনের অপিওইড শনাক্ত করতে সক্ষম। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি নেশাজনিত রোগ শনাক্তে দ্রুততা ও নির্ভুলতা এনে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে অপিওয়েড বা আফিম-সদৃশ ঔষধ সেবনজনিত সমস্যায় প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, এবং অনেক গর্ভবতী নারীর অপিওয়েড সেবনের ফলে তাদের নবজাতকেরা ভোগে "Neonatal Abstinence Syndrome" (NAS)-এ। এই প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি দুটি গবেষণা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে অপিওয়েড শনাক্তকরণ প্রযুক্তিতে, যা একদিকে নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করতে পারবে, অপরদিকে অপিওয়েড সেবনের প্রকৃত মাত্রা নিরূপণে সাহায্য করবে। গবেষণা দুটির নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশের গবেষক রামিসা ফারিহা।

প্রথম গবেষণাটি, প্রকাশিত হয়েছে *Scientific Reports* জার্নালে, যেখানে গবেষকেরা মাত্র ২০ মাইক্রোলিটার রক্ত (আঙুলের অগ্রভাগ থেকে নেওয়া একফোঁটা) ব্যবহার করে ৬টি ভিন্ন অপিওয়েড যৌগ নির্ভুলভাবে শনাক্তের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় এবং উচ্চ-দক্ষ

পদ্ধতি (LC-MS/MS assay) তৈরি করেছেন। সাধারণ ইউরিন টেস্টের তুলনায় এই প্রযুক্তি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, কারণ এতে ক্রস-রিঅ্যাকটিভিটি বা ভুয়া পজিটিভ ফলাফলের ঝুঁকি নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক রোগীর শরীরে অপিওয়েডের অস্তিত্ব থাকলেও তা ইউরিন স্ট্রিপ টেস্টে ধরা পড়ে না, কিন্তু এই নতুন পদ্ধতিতে তা ধরা সম্ভব হচ্ছে।

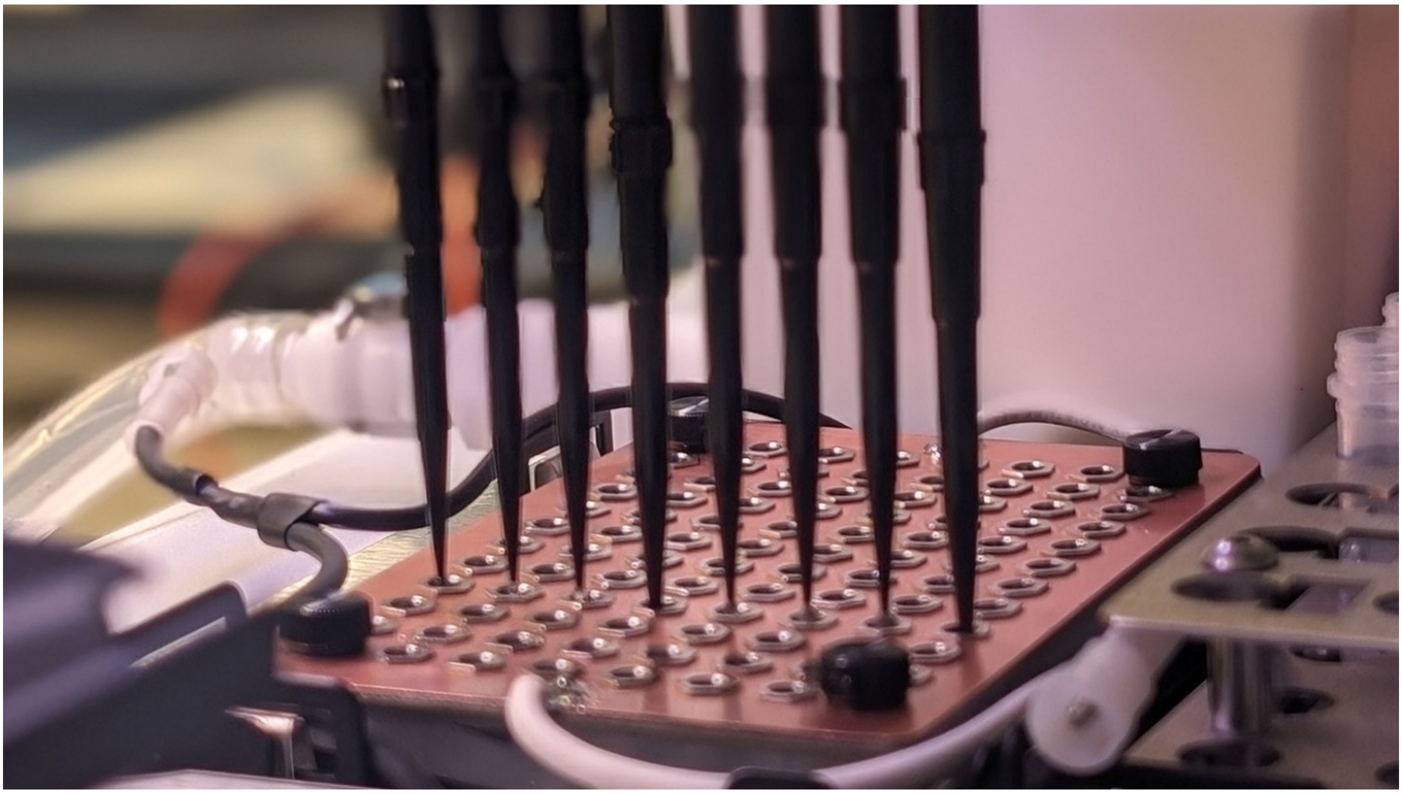

Tripathi Lab/Brown University

গবেষণা দুটির প্রধান গবেষক রামিসা ফারিহা। তিনি বড় হয়েছেন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলায়। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টডক্টরাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (Danny L'Amour)

অন্যদিকে, *SLAS Technology* জার্নালে প্রকাশিত দ্বিতীয় গবেষণাটি মূলত Neonatal abstinence syndrome (NAS) শনাক্তে অভাবনীয় নতুন এক সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। গবেষকেরা এমন একটি ইলেকট্রিক-ফিল্ড চালিত (electric field-assisted) ডিভাইস তৈরি করেছেন, যা নবজাতকের ড্রাই ব্লাড স্পট (DBS)-এ থাকা মাত্র ৩.২ মিমি আকারের রক্তের নমুনা থেকেও মাত্র ৩ মিনিটেই ৫টি ভিন্ন অপিওইড বিশ্লেষণ করতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরোনো ধীর ও পর্যবেক্ষণ-নির্ভর NAS শনাক্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে পাওয়া যাবে নির্ভুল এবং দ্রুত ফলাফল, যা চিকিৎসা শুরু করতেও সহায়তা করবে দ্রুত সময়ের মধ্যে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ডিভাইসটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে, ফলে ল্যাবরেটরির কাজের গতি ও নির্ভুলতা বাড়বে বহুগুণ।

দুটি গবেষণাই "microsampling" বা অতি-ক্ষুদ্র রক্ত ব্যবহার করে উচ্চ-সংবেদনশীল বিশ্লেষণ প্রযুক্তির সম্ভাবনা প্রমাণ করেছে। একটিতে প্রাপ্তবয়স্কদের রক্তে অপিওয়েড শনাক্তকরণ, অন্যটিতে নবজাতকের ড্রাই ব্লাড স্পট থেকে অপিওইড নির্ণয়ে অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নয়, জনস্বাস্থ্য, ফার্মাকোভিজিলেন্স, এমনকি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই উদ্ভাবনাগুলো অপিওয়েড মহামারির মোকাবিলায় এক নতুন যুগের সূচনা করলো। গবেষকদের মতে, আরও উন্নয়ন হলে এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে অপিওইড

স্ক্রিনিং ও চিকিৎসা নির্ধারণ আরও নির্ভরযোগ্য ও সময়োপযোগী হবে।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: DOI: [10.1038/s41598-025-99130-5](10.1038/s41598-025-99130-5), 10.1016/j.slast.2025.100282

স্বাস্থ্য

দেশ ভেদে বার্ধক্যের হার কেন ভিন্ন হয়?

সামাজিক বৈষম্য, দুর্বল গণতন্ত্র ও পরিবেশগত দূষণ মানুষের বার্ধক্য দ্রুততর করে, বলছে ৪০ দেশের উপর চালানো এক গবেষণা। অন্যদিকে শিক্ষা ও দৈনন্দিন কাজের সক্ষমতা বার্ধক্য রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি শহরে বাস করা এক নারী, যেখানে বায়ুদূষণ খুব বেশি। সেখানে মানুষ অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্রুত বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। কারণ, বায়ুদূষণ দ্রুত বার্ধক্যের একটি ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত (Per-Anders Pettersson/Getty Images)

সমাজে বৈষম্য এবং দুর্বল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দ্রুত বার্ধক্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। চারটি মহাদেশে পরিচালিত এক বিস্তৃত গবেষণায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে, শিক্ষা বার্ধক্যকে ধীর করতে সবচেয়ে কার্যকর উপাদানগুলোর একটি। গবেষণাটি গত ১৫ জুলাই, ২০২৫ এ *Nature Medicine* জার্নালে প্রকাশিত হয়।

গবেষণাটিতে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের মতো পরিচিত কারণগুলোর কথাও উঠে এসেছে, যেগুলো বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে। তবে গবেষকেরা বলছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবগুলোর সংযুক্তি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে কেন বিভিন্ন দেশে বার্ধক্যের গতি এতটা ভিন্ন হয়।

গবেষণার প্রধান গবেষক আগুস্তিন ইবানেজ বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন এবং অনিশ্চয়তার এই যুগ আমাদের এক ধরনের “হতাশার জগতে” নিয়ে গেছে যা মানুষকে মানসিক ও শারীরিকভাবে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

"আমরা ভাবিই না, এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর কত বড় প্রভাব ফেলছে।"

বয়সের ব্যবধান

গবেষণায় ৪০টি দেশের মোট ১,৬১,৯৮১ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৭টি দেশ লাতিন আমেরিকায়, ২৭টি ইউরোপে, ৪টি এশিয়ায় এবং ২টি আফ্রিকায় অবস্থিত। বিভিন্ন দেশের তথ্য সমন্বয় করতে অর্থাৎ নিশ্চিত করতে যে সব ভেরিয়েবল একইভাবে মাপা হয়েছে তা প্রায় তিন বছর লেগে গেছে, বলেন ইবানেজ।

গবেষকেরা আগে থেকে বিদ্যমান গবেষণাগুলো বিশ্লেষণ করে এমন সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করেন যেগুলো বার্ধক্য বাড়াতে বা কমাতে ভূমিকা রাখে এবং যেগুলো দেশের মধ্যে তুলনাযোগ্য। এরপর এই তথ্যগুলো একটি মেশিন লার্নিং মডেলে ট্রেইন করানো হয়, যা কারও প্রকৃত বয়সের তুলনায় তার শরীর-মন কতটা "বুড়ো" হয়েছে তা নির্ধারণ করে।

যেমন, যদি কারও প্রকৃত বয়স হয় ৫০ বছর, কিন্তু মডেল বলছে তারা ৬০ বছরের মতো, তাহলে তাদের 'বায়োবিহেভিয়ারাল এজ গ্যাপ' হলো ১০ বছর।

গবেষণায় দেখা গেছে, মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বার্ধক্য দ্রুত হচ্ছে, ইউরোপে সবচেয়ে ধীরে, এবং এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা মাঝামাঝি অবস্থানে।

গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের সূচক যেমন ভোটাধিকারের সীমাবদ্ধতা, অন্যায্য নির্বাচন, রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ ইত্যাদির সঙ্গে দ্রুত বার্ধক্যের শক্ত সম্পর্ক পাওয়া গেছে যা গবেষকদের জন্যও ছিল বিস্ময়কর। এছাড়া কম জাতীয় আয়, বায়ু দূষণ, সমাজে বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যও এর সঙ্গে জড়িত।

২১,৬৩১ জন অংশগ্রহণকারীর তথ্যের মধ্যে কিছু ছিল ৪ বছর ব্যবধানে নেওয়া, যার ফলে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের তুলনা করা সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য থেকে দেখা যায়, যাদের বয়সের ব্যবধান বেশি, তাদের কগনিটিভ ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন কাজ করার সক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায়।

মানসিক চাপের মূল্য

এই সব সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান কীভাবে শরীরের বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তা এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তবে ইবানেজ মনে করেন, মানসিক চাপের কারণে শরীর ও মস্তিষ্কে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয়, সেটাই মূল কারণ হতে পারে।

তবে গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা আছে। যেহেতু এতগুলো দেশের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন ধূমপানের মতো বিষয় বাদ দিতে হয়েছে, কারণ সেগুলো দেশে দেশে ভিন্নভাবে মাপা হয়েছে।

স্যুয়েমোতো আরও বলেন, "মাত্র ৪ বছরের ফলোআপ ডেটা বার্ধক্য বিশ্লেষণের জন্য খুবই সীমিত।" তিনি অন্তত ১০ বা ২০ বছর ব্যবধানের তথ্য দেখতে চান।

তবে দুজনই আশাবাদী, ভবিষ্যতে কোনও দেশের জন্য বয়স বাড়ার প্রধান কারণগুলো বুঝে সেই অনুযায়ী সরকারি নীতিনির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হলো, মডেল কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত বয়সের চেয়ে কম বয়স দেখিয়েছে — অর্থাৎ তারা জীববৈজ্ঞানিকভাবে 'তরুণ'। ইবানেজ বলেন, "এই মানুষদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো খতিয়ে দেখলে হয়তো অন্যদেরও অকাল বার্ধক্য থেকে রক্ষা করার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।"

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41591-025-03808-2

চিকিৎসাবিজ্ঞান

মাইটোকন্ড্রিয়াল ডোনেশন পদ্ধতির সাফল্য

যুক্তরাজ্যে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডোনেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে আটটি সুস্থ শিশুর জন্ম হয়েছে, যারা মারাত্মক জিনগত রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত।

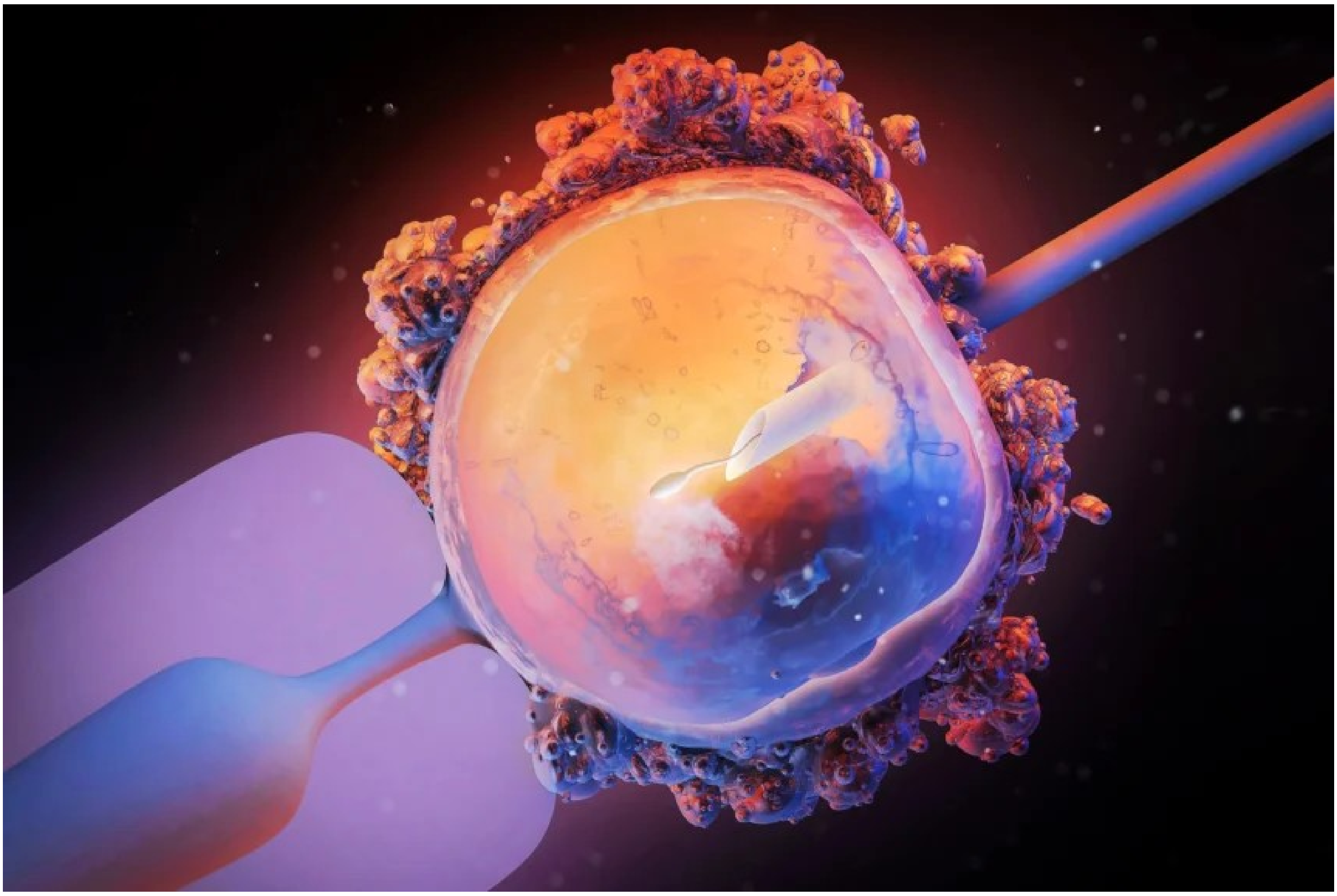

Maurizio De Angelis/Science Source

যুক্তরাজ্যে জন্ম নেওয়া আটটি শিশু এখন সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। এদের জন্মের নেপথ্যে রয়েছে একটি যুগান্তকারী এবং কিছুটা বিতর্কিত চিকিৎসা পদ্ধতি, মাইটোকন্ড্রিয়াল ডোনেশন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এমন এক প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন, যার ফলে মারাত্মক জেনেটিক রোগ নবজাতকের দেহে যাওয়া রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই শিশুদের মা ও বাবার পাশাপাশি একটি তৃতীয় নারীর ডিম্বাণুর মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে এসেছে তাদের জীবনরক্ষা করা ডিএনএ অংশ। এই পদ্ধতিকে "থ্রি পার্সন ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF)" বলেও অভিহিত করা হয়।

নিউ ইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেম-সেল বিজ্ঞানী ডিয়েট্রিচ এগলি বলেছেন, "এটি মাইটোকন্ড্রিয়াল রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী গবেষণা"

মাইটোকন্ড্রিয়া হলো কোষের শক্তিঘর, যা শুধুমাত্র মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে। যদি মায়ের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ-তে ক্ষতিকর মিউটেশন থাকে, তবে তার সন্তানের হার্ট, মস্তিষ্ক বা পেশিতে গুরুতর বংশগত রোগ দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতি এড়াতে গবেষকেরা 'প্রনিউক্লিয়ার ট্রান্সফার' নামে একটি প্রক্রিয়া বেছে নেন। এতে প্রথমে মায়ের নিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়ার ডিএনএ মাইটোকন্ড্রিয়া সুস্থ এমন অন্য একটি নারীর ডোনার ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। এরপর এই নতুন ডিম্বাণুটি গর্ভস্থ করা হয়।

২০১৫ সালে যুক্তরাজ্য এই পদ্ধতির আইনগত অনুমোদন দেয়, এবং নিউক্যাসলের একটি ফার্টিলিটি সেন্টারে সীমিতভাবে এর ব্যবহার শুরু হয়। এমনকি ২০২৩ সালে গার্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াল ডোনেশনের মাধ্যমে সে সময় যুক্তরাজ্যে পাঁচটি পর্যন্ত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্য এবং এই কৌশলের কার্যকারিতা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্ন সম্পর্কে খুব কম তথ্যই ছিল।

কিন্তু সদ্যপ্রকাশিত দুটি গবেষণা প্রবন্ধে দেখা যায়, মোট ২২ জন নারী এই চিকিৎসা গ্রহণ করেন, যাদের মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনে মারাত্মক ভুল ছিল। এদের মধ্যে আটজন সুস্থ শিশুর জন্ম দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় শিশু এখন দুই বছরের বেশি বয়সী, আর সবচেয়ে ছোটটির বয়স পাঁচ মাসের কম।

এই আট শিশুর মধ্যে পাঁচজনের শরীরে ক্ষতিকর মিউটেশন একেবারেই পাওয়া যায়নি। বাকি তিনজনের শরীরে ৫ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত 'প্যাথোজেনিক মাইটোকন্ড্রিয়া' পাওয়া গেছে। এই মাত্রা এখনো রোগ সৃষ্টি করার মতো পর্যায়ে নয়, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এসব মাত্রা বাড়তে পারে কি না, তা নিয়ে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখা দরকার। এই তিনজনের মধ্যে দুজন মেয়ে, যারা ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদের মধ্যে এই মিউটেশন ছড়িয়ে দিতে পারে, যদি না সতর্কভাবে গর্ভকালীন জিন-পরীক্ষা করা হয়।

সন্তানদের স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতি নিয়ে গবেষকেরা আশাবাদী হলেও কিছু সাময়িক সমস্যা দেখা গেছে। এক শিশু অল্প সময়ের জন্য শিশুকালীন মায়োক্লোনিক এপিলেপসিতে ভুগেছিল, যা নিজে থেকেই সেরে গেছে। আরেক শিশুর মধ্যে জন্মের পর হালকা হৃদরোগ এবং উচ্চ চর্বির মাত্রা ধরা পড়ে, যা চিকিৎসার মাধ্যমে ঠিক হয়ে গেছে। এই শিশুর মা গর্ভকালেই উচ্চ মাত্রার ট্রাইগ্লিসারাইড সমস্যায় ভুগছিলেন।

এই গবেষণাগুলো এটাও প্রমাণ করে যে 'মাইটোকন্ড্রিয়াল ডোনেশন' ও 'প্রি-ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক টেস্টিং' একত্রে ব্যবহার করলে জিনগত রোগ সৃষ্টিকারী ডিএনএ-এর বংশগতি উল্লেখযোগ্যভাবে রোধ করা সম্ভব। তবে এই পদ্ধতিগুলো পুরোপুরি রোগ প্রতিরোধ করে কি না, সেটি নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে।

গবেষকদের মতে, এই প্রযুক্তি জিনগত রোগ প্রতিরোধে এক নতুন দিগন্ত খুলেছে, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা মারাত্মক মাইটোকন্ড্রিয়াল রোগে আক্রান্ত সন্তান জন্মদানের ঝুঁকিতে রয়েছেন। তবে সতর্কতা ও দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ ছাড়া এটি নিশ্চিত চিকিৎসা নয়।

তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিজ্ঞান আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে তিনজন মানুষের ডিএনএ দিয়ে একটি শিশুর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনা একাধারে বিস্ময়কর এবং আশার আলো জাগানো এক অধ্যায়।

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

রেফারেন্স: DOI: 10.1056/NEJMoa2415539

জ্যোতির্বিজ্ঞান

'ক্যামেরায়' ধরা পড়ল এক সৌরজগতের জন্ম!

বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো একটি নবীন সৌরজগত HOPS-315 আবিষ্কার করেছেন, যেখানে গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া মাত্র শুরু হয়েছে। ওয়েব টেলিস্কোপ ও ALMA-এর সাহায্যে তারা উষ্ণ খনিজ পদার্থ ও সিলিকন মনোক্সাইড শনাক্ত করেছেন, যা গ্রহ তৈরির প্রাথমিক উপাদান। এই আবিষ্কার আমাদের নিজস্ব সৌরজগতের জন্ম বুঝতে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

প্রথমবারের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের বাইরে একটি সদ্য গঠিত সৌরজগতের খোঁজ পেয়েছেন। উক্ত সৌরজগতটিতে এখন গ্রহ তৈরির সূচনা ঘটছে। বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা এমন একটি নবীন সৌরজগতের খোঁজে ছিলেন, যাতে আমাদের নিজস্ব সৌরজগতের উৎপত্তি ও বিকাশ বোঝা যায়। এই গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে পৃথিবীভিত্তিক ও মহাকাশভিত্তিক টেলিস্কোপ। লক্ষ্যবস্তু ছিল পৃথিবী থেকে ৪২০ পারসেক দূরের এক তরুণ নক্ষত্র যার নাম HOPS-315। এ ব্যাপারে গবেষণাপত্রটি গত ১৬ জুলাই, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রাকাশিত হয়।

পারডিউ ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গবেষণাপত্রটির কো-রাইটার মেরেল ফান্ট হফ বলেন, "আমরা অনেকদিন ধরেই এমন এক 'শিশু সৌরজগত' খুঁজছিলাম, যা আমাদের নিজস্ব সৌরজগতের শৈশবকালের প্রতিরূপ হতে পারে।"

প্রথমে বিজ্ঞানীরা HOPS-315-কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন কারণ এর চারপাশে crystalline silicate খনিজের উপস্থিতি ধরা পড়ে যা গ্রহ গঠনের শুরুর দিকের চিহ্ন। সাধারণত এই ধরণের খনিজ কণাগুলো গ্যাস ও ধূলিকণার ঘূর্ণায়মান ডিস্কে ঘনীভূত হয়ে গ্রহ গঠন শুরু করে।

ওরায়ন নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত এই নবীন নক্ষত্রটিকে বিজ্ঞানীরা আকর্ষণীয় মনে করেন আরও একটি কারণে।

কারণটি হলো এর ডিস্ক বা ঘূর্ণায়মান গ্যাস-ধূলির স্তরটি দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কারভাবে। সচরাচর নবজাত নক্ষত্র থেকে নির্গত গ্যাসজেট (outflow) এই ডিস্ক ঢেকে ফেলে, কিন্তু HOPS-315 ছিল অনন্য, কারণ তার ডিস্ক সম্পূর্ণ দৃশ্যমান ছিল।

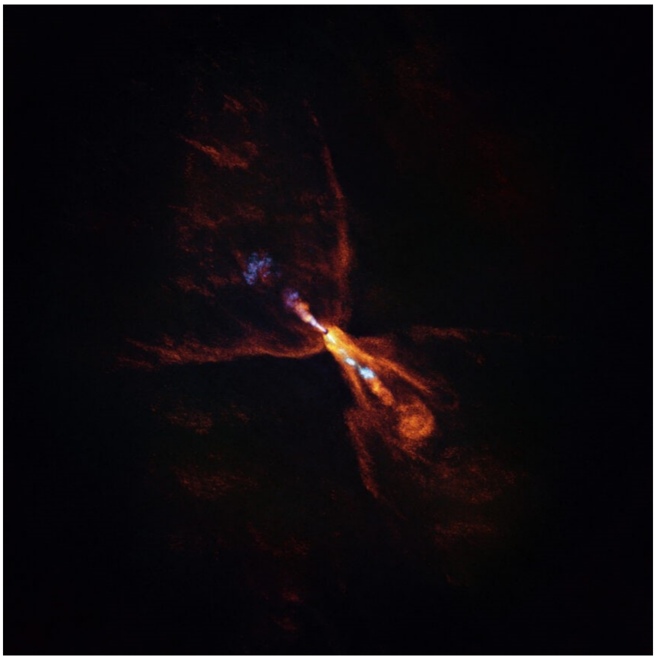

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

এই ডিস্কের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন James Webb Space Telescope (JWST)। তারা সেখানে প্রথমবারের মতো উষ্ণ সিলিকন মনোক্সাইড (SiO) এর উপস্থিতি শনাক্ত করেন। সেইসঙ্গে দেখা যায়, ডিস্কের মধ্যবর্তী অংশ খুবই উষ্ণ এবং সেই উষ্ণতায় খনিজ গলে গিয়ে পরে ঠান্ডা হয়ে আবার ঘনীভূত হয়েছে যা গ্রহ গঠনের জন্য অপরিহার্য উপাদান।

গবেষণার প্রধান লেখক, লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেলিসা ম্যাকক্লুর বলেন, "এই গরম খনিজ পদার্থই ডিস্কে গ্রহ তৈরির প্রথম উপাদান। এখান থেকেই সবকিছুর শুরু।"

এই গবেষণায় আরও অংশ নিয়েছে চিলির Atacama Large Millimeter-submillimeter Array (ALMA)। ALMA ও JWST-র সমন্বিত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এই নবীন নক্ষত্রের মাঝামাঝি অংশে এতটা উত্তাপ ছিল যে তা পাথরকে বাষ্পে পরিণত করেছে। পরে সেই গ্যাস ঠান্ডা হয়ে আবার খনিজে পরিণত হয়েছে।

ম্যাকক্লুর বলেন, "HOPS-315-কে আমরা এমন এক মুহূর্তে দেখেছি, যেটাকে বলা যায় গ্রহ গঠনের 'টাইম জিরো'। এই মুহূর্তটি আগে কখনও এত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি।"

এর আগে বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতের অতীত ব্যাখ্যা করেছেন উল্কাপিণ্ড বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেগুলো ছিল সৌরজগত গঠনের সময়কার অবশিষ্টাংশ। তবে, HOPS-315-এর মতো 'লাইভ অ্যাকশন' দৃশ্যপট আমাদের নতুন তথ্য দেয়। "এটা দেখে আমরা ভাবতে পারি, আমাদের সূর্য মাত্র এক লক্ষ বছর বয়সে এমন পরিস্থিতির মধ্যেই দিয়ে যাচ্ছিল," বলেন ম্যাকক্লুর।

গবেষণায় অংশ না নিলেও, যুক্তরাষ্ট্রের National Radio Astronomy Observatory-র জ্যোতির্বিদ জন টোবিন মনে করেন, "এই প্রথম আমরা গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়াটাকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমরা এখনও কেবল এর প্রাথমিক স্তরে পৌঁছেছি।"

ফান্ট হফ বলেন, তিনি HOPS-315 সম্পর্কে আরও জানতে চান। এর গঠন, তাপমাত্রা এবং এর মধ্যে আর কী কী অণু রয়েছে। এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে চান এই নবীন সৌরজগত কীভাবে বেড়ে উঠবে, কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় কী হবে। "মানুষের বেড়ে ওঠার ধাপগুলোর মতোই, প্রতিটি সৌরজগত আলাদা আলাদা। সেটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করছি।"

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09163-z*

পদার্থবিজ্ঞান

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নিখুঁত ঘড়ি

যুক্তরাষ্ট্রের NIST গবেষকরা এমন একটি পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করেছেন, যা আগের চেয়ে ৪১% বেশি নির্ভুল এবং ২.৬ গুণ বেশি স্থিতিশীল। এটি অ্যালুমিনিয়াম আয়নের সূক্ষ্ম কম্পন মেপে প্রতি সেকেন্ড নির্ধারণ করে ১৯ দশমিক ঘর পর্যন্ত। এই প্রযুক্তি মহাকাশ, পদার্থবিজ্ঞান ও সময় পরিমাপের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

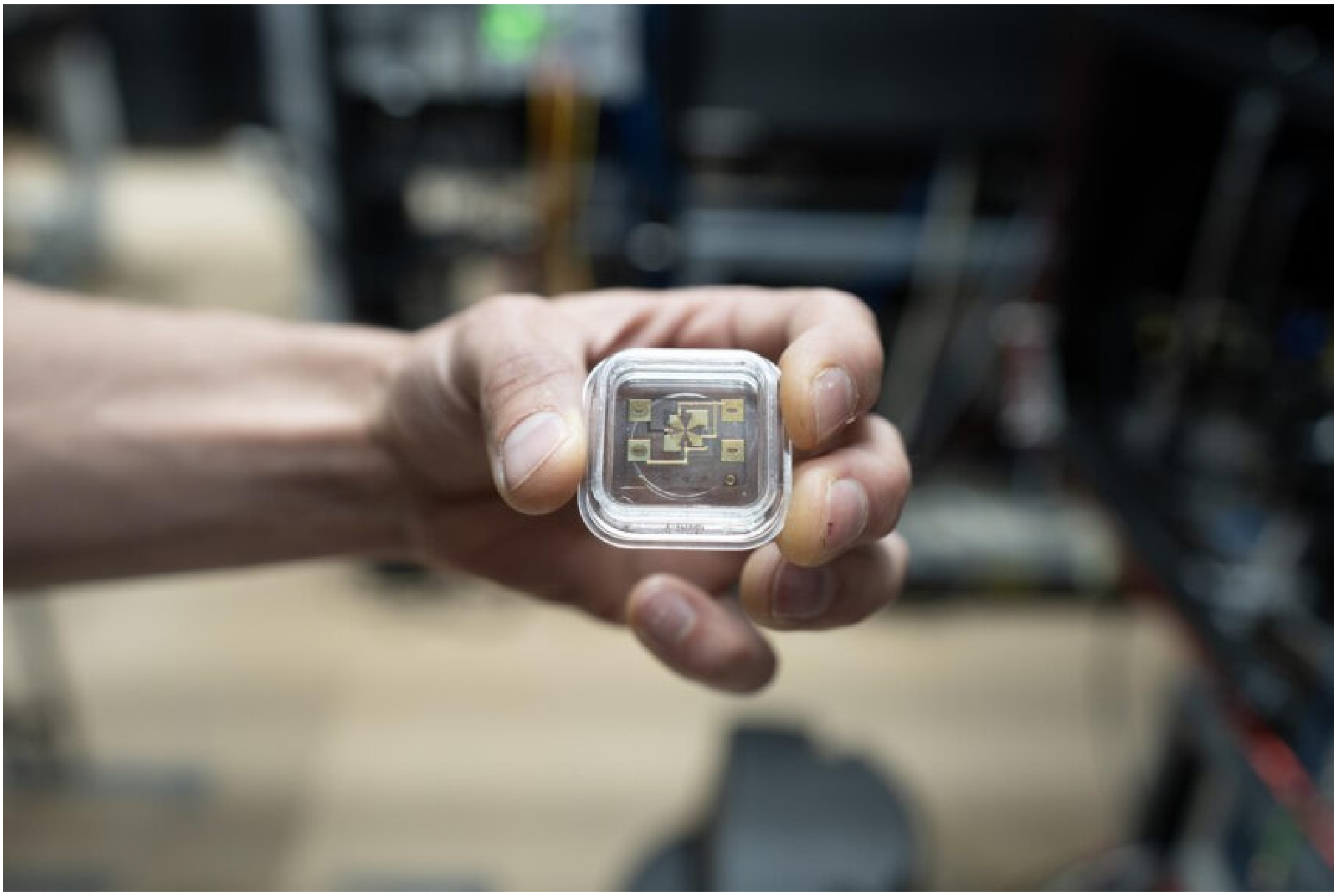

R. Jacobson/NIST

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি (NIST)-এর গবেষকদের নেতৃত্বে বিজ্ঞানীরা এমন এক ঘড়ি তৈরি করেছেন, যা আগের রেকর্ডধারীর চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি নির্ভুল।

এই ঘড়িটি একটি অ্যালুমিনিয়াম আয়নকে প্রায় শূন্য কেলভিন তাপমাত্রায় ঠান্ডা করে তার অতি সূক্ষ্ম কম্পন পরিমাপ করে সময় গণনা করে। এইভাবে প্রতি সেকেন্ডকে ১৯ দশমিক স্থান পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যায়।

শুধু নির্ভুলতাতেই নয়, ঘড়িটি তার ধরণের অন্য যেকোনো ঘড়ির তুলনায় ২.৬ গুণ বেশি স্থিতিশীলও।

NIST-এর পদার্থবিদ মেসন মার্শাল বলেন, "এতটাই নিখুঁত ঘড়ি নিয়ে কাজ করা সত্যিই রোমাঞ্চকর। এখানে আমরা দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, যা পদার্থবিজ্ঞান ও আমাদের চারপাশের জগত সম্পর্কে বোঝাপড়াকে আরও গভীর করে।"

২০ বছর ধরে চলা গবেষণার ফলাফল এই রেকর্ড-ব্রেকিং ঘড়ি। এটি তৈরি করতে বিজ্ঞানীদেরকে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কাজে লাগাতে হয়েছে। ঘড়ির আশপাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গতিবিধিও তার সময় গণনায় প্রভাব ফেলতে পারে।

এই সমস্যার সমাধান করতে গবেষকরা ঘড়ির খোলসে ব্যবহৃত ডায়মন্ড ওয়েফারকে আরও ঘন করেন এবং ইলেকট্রোডগুলোর স্বর্ণ প্রলেপ আরও পুরু করেন। এর ফলে ঘড়ির সময় নির্ধারণে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র আরও স্থিতিশীল হয়।

ঘড়িটির নির্ভরযোগ্যতার আরেকটি চাবিকাঠি হলো এতে অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে একটি চার্জযুক্ত ম্যাগনেসিয়াম আয়নের জোড়া তৈরি করা। এই 'সহচর আয়ন' অ্যালুমিনিয়াম আয়নকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ করে তোলে, বিশেষত লেজার আলোর মাধ্যমে। এতে নির্ভুলতা ও স্থিতিশীলতার সঠিক সমন্বয় তৈরি হয়।

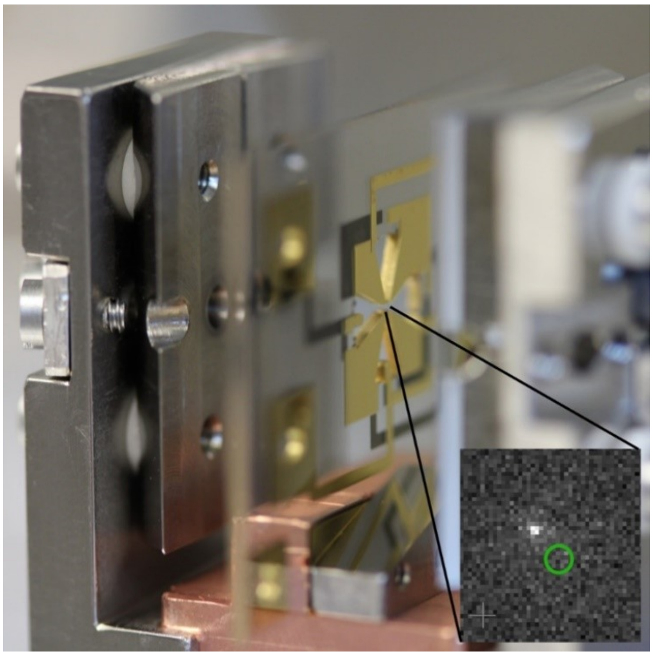

এনআইএসটির অ্যালুমিনিয়াম আয়ন ঘড়ির জন্য নতুনভাবে পরিবর্তিত আয়ন ট্র্যাপ, এখানে ইনসেটে একটি CCD ইমেজে অ্যালুমিনিয়াম-ম্যাগনেশিয়াম আয়ন যুগল দেখা যাচ্ছে। বৃত্তের মধ্যে থাকা অংশটি হলো অ্যালুমিনিয়াম আয়নের অবস্থান, যা ক্যামেরার কাছে অন্ধকার দেখায়, কারণ এটি কেবল কোয়ান্টাম লজিক স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবহার করে ম্যাগনেশিয়াম আয়নের মাধ্যমে পড়া যায় (NIST)

ঘড়িতে ব্যবহৃত লেজার আলো আসছিল কাছাকাছি আরেকটি গবেষণাগার থেকে, যা প্রায় ৩.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং নির্ভুল লেজার তৈরিতে বিখ্যাত।

আগে এই মাত্রার সেকেন্ড পরিমাপের জন্য যে পরিমাণ তথ্য জোগাড় করতে তিন সপ্তাহ সময় লাগত, এখন তা সম্ভব হচ্ছে মাত্র দেড় দিনে।

NIST-এর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ড্যানিয়েল রদ্রিগেজ কাস্টিলো বলেন, “এটি একটি বিশাল এবং জটিল চ্যালেঞ্জ, কারণ ঘড়ির প্রতিটি অংশ তার কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে।”

এই ঘড়ি আমাদের হাতে-পরা ঘড়ির মতো সময় বলে না। বরং এটি সময় পরিমাপের জন্য একটি আদর্শ রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে যেটি অন্যান্য ঘড়ি ক্যালিব্রেট করতে, নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় এবং মহাবিশ্বকে বুঝতে ব্যবহৃত হয়। একটি সেকেন্ড আসলে কত সময় তা জানা পদার্থবিজ্ঞানের একটি মৌলিক বিষয়।

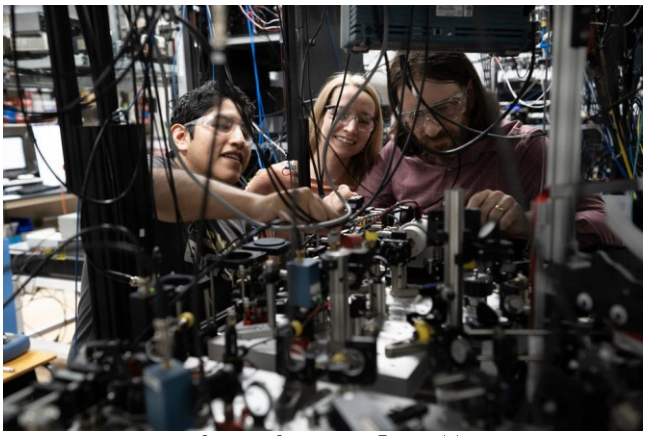

(বাম থেকে ডানে) ড্যানিয়েল রদ্রিগেজ ক্যাস্টিলো, উইলা আর্থার-ডওয়ারশ্যাক এবং মেসন মার্শাল একসাথে এনআইএসটি-এর বোল্ডারে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন ঘড়ি নিয়ে কাজ করছেন। এই পারমাণবিক ঘড়িটি নির্ভুলতার একটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে (R. Jacobson/NIST)

এই উন্নত টাইমকিপিং প্রযুক্তি ডার্ক ম্যাটার অনুসন্ধান থেকে শুরু করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পরীক্ষার মতো বহু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। গবেষকদের ধারণা, এর থেকেও বেশি নির্ভুলতা অর্জন করা সম্ভব, যদি সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং আয়ন নিয়ন্ত্রণ আরও উন্নত করা যায়।

NIST-এর পদার্থবিজ্ঞানী উইলা আর্থার-ডোর্শাক বলেন, “এই প্ল্যাটফর্ম আমাদের সামনে নতুন ধরনের ঘড়ির ডিজাইন তৈরির সুযোগ এনে দিয়েছে, যেমন ঘড়িতে ব্যবহৃত আয়নের সংখ্যা বাড়ানো বা এনট্যাঙ্গেলমেন্ট (entanglement)। এতে করে আমাদের পরিমাপ করার সক্ষমতা আরও উন্নত হবে।”

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

রেফারেন্স: DOI: 10.1103/hb3c-dk28

মস্তিষ্ক

মস্তিষ্ক কীভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠে?

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম ভাঙার সময় মস্তিষ্কে একটি সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে ধাবমান ‘জাগরণ ফিকোয়েন্সি’ ছড়িয়ে পড়ে, যা ধীরে ধীরে কনশাসনেস ফিরিয়ে আনে। NREM ঘুমে ধীর তরঙ্গ দিয়ে শুরু হয়ে উচ্চ তরঙ্গ পর্যন্ত

পৌঁছায়, যেখানে REM ঘুমে সরাসরি উচ্চ তরঙ্গ সক্রিয় হয়। এই ধারা ঘুমজড়তা ও ঘুমজনিত রোগ বোঝার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচন করতে পারে।

ঘুম ভাঙার মুহূর্তে আমরা অনেকেই ক্লান্তি, বিভ্রান্তি বা অস্বচ্ছতার অনুভব করি, যাকে বলা হয় sleep inertia বা ঘুম জড়তা। কিন্তু মস্তিষ্ক ঠিক কীভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই সম্প্রতি একটি বিস্তৃত গবেষণা চালিয়েছেন ইউরোপের একদল স্নায়ুবিজ্ঞানী। গত ১৬ জুলাই, ২০২৫ Current Biology জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণা আমাদের জানায়, ঘুম থেকে জেগে ওঠা কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, যার মাঝে সময় ও স্থানের এক অভূতপূর্ব অনুপ্রবাহ রয়েছে।

গবেষকরা ২০ জন মানুষের ওপর ১,০৭৩টি ঘুম ভাঙার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন এক বিশেষ ইইজি (EEG) প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সময়মানের ভেতরে মাপতে সক্ষম। তারা দেখতে পান, ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় মস্তিষ্কে একটি অভিন্ন, সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে বিস্তৃত "জাগরণ তরঙ্গ" ছড়িয়ে পড়ে।

এই তরঙ্গ শুরু হয় প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স বা নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে থাকা অঞ্চলে, তারপর ধীরে ধীরে পিছনের ভিজ্যুয়াল কর্টেক্স পর্যন্ত পৌঁছায়। NREM ঘুমে (non-rapid eye movement sleep), এই পরিবর্তন শুরু হয় একটি লো-ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ দিয়ে, অর্থাৎ ধীরগতির। গভীর ঘুমের সাথে সম্পর্কিত এই তরঙ্গ কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গা করে দেয় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গকে, যা সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে।

REM ঘুম (rapid eye movement sleep) থেকে জেগে ওঠার সময় হাই-ফ্রিকোয়েন্সি (উচ্চ গতি) তরঙ্গ সক্রিয় হয়, কোনো পূর্ববর্তী ধীর তরঙ্গ ছাড়াই। অপরদিকে, NREM ঘুমে জাগরণ হয় বেশ 'জটিল' প্রক্রিয়ায়। প্রথমে ধীর, বড় অ্যামপ্লিচিউডের ঢেউ (যেমন K-complex) দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে দ্রুত গতি ও সচেতনতায় রূপ নেয়।

গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: ঘুম থেকে উঠে কেন আমরা মাঝে মাঝে বোধগম্যতা হারাই, আবার কখনও ফ্রেশ অনুভব করি? গবেষকরা আবিষ্কার করেন, যেসব মানুষ NREM ঘুম থেকে জাগে এবং তাদের মস্তিষ্কে জাগরণ-পূর্ব ধীর তরঙ্গ বেশি থাকে, তারা সাধারণত জেগে উঠে কম ক্লান্তি অনুভব করে। এই ঢেউগুলো মূলত 'type I slow waves', যার মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী, তীক্ষ্ণ K-complex গুলি, যেগুলো জাগরণ ব্যবস্থাকে প্রস্তুত করে। বিপরীতে, যদি ঘুমের পরে আরও ধীর তরঙ্গ সক্রিয় থাকে (যেমন 'type II' slow waves), তবে মানুষ আরও বেশি ঘুমজড়তা অনুভব করে।

এই আবিষ্কার ঘুমজনিত নানা সমস্যার চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, বিশেষ করে ইনসমনিয়া (ঘুমের অসুবিধা), প্যারাসমনিয়া (ঘুমের মধ্যে আচরণগত ব্যাঘাত), বা স্লিপ অ্যাপনিয়া (ঘুমে শ্বাসকষ্ট)। এমনকি, ঘুম থেকে দ্রুত ও পরিষ্কারভাবে ওঠার কৌশল বা প্রযুক্তি (যেমন অ্যালার্ম ডিজাইন) উন্নত করতেও এটি কার্যকর হতে পারে।

লেখক: ওয়াশফিয়া জয়ন্তী

রেফারেন্স: *DOI: 10.1016/j.cub.2025.06.064*

উপাদান বিজ্ঞান

প্লাস্টিকের বিকল্পে ব্যাকটেরিয়ার সেলুলোজ!

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনের সহকারী অধ্যাপক ড. মাকসুদ রহমান ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ দিয়ে প্লাস্টিকের বিকল্প এক বহুমুখী, শক্তিশালী ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ তৈরি করেছেন। এই নতুন প্রযুক্তি মাত্র একটি ধাপেই উৎপাদন করা সম্ভব।

প্লাস্টিক বর্জ্যে পৃথিবী যখন পরিবেশগত সংকটে জর্জরিত, তখন পরিবেশবান্ধব বিকল্প উপকরণের সন্ধানেই নতুন আশার আলো দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনের সহকারী অধ্যাপক ড. মাকসুদ রহমান।

বাংলাদেশের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পড়াশোনা শেষ করা এই বিজ্ঞানী ও তাঁর গবেষণা দল এমন এক নতুন ধরণের জৈববস্তু তৈরি করেছেন, যা ভবিষ্যতে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হতে পারে।

এই গবেষণায় তাঁরা ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি সেলুলোজকে (bacterial cellulose) বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর করে এমন এক ধরনের পাতলা এবং শক্তিশালী শীটে পরিণত করেছেন, যেটি পানির বোতল, খাদ্য প্যাকেটিং, এমনকি ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত ড্রেসিং হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব। ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান, পচনশীল (biodegradable) এবং পরিবেশবান্ধব। গবেষকেরা একে আরও কার্যকর করতে এতে বোরন নাইট্রাইড নামক একধরনের ন্যানোশীট সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এটি অধিকতর শক্তিশালী ও তাপ পরিবাহী হয়ে উঠেছে।

Jorge Vidal/Rice University

১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে *Nature Communications*-এ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এবং এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ড. মাকসুদ রহমান। গবেষণাপত্রের প্রথম লেখক হিসেবে কাজ করেছেন রাইস ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক এম.এ.এস.আর. সাদী। গবেষণার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ছিলেন শ্যাম ভক্তা, সাকিব হাসানসহ আরও অনেকে।

গবেষকদল একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা আবর্তনশীল (rotational) কালচার ডিভাইস তৈরি করেছেন, যেখানে ব্যাকটেরিয়া একটি ঘূর্ণায়মান তরল মাধ্যমে চলাচল করে। এই ধারাবাহিক এবং নিয়ন্ত্রিত গতি ব্যাকটেরিয়াগুলোর দ্বারা উৎপাদিত সেলুলোজ ফাইবারগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজাতে সাহায্য করে। ফলে উৎপন্ন সেলুলোজ শীটগুলো খুবই শক্তিশালী, নমনীয় এবং স্বচ্ছ হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, এই বিশেষভাবে তৈরি ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ শীটের টেনসাইল স্ট্রেংথ ৫৫৩ মেগা প্যাসকেল পর্যন্ত হতে পারে, যা সাধারণ প্লাস্টিক বা কাঁচের তুলনাতেও অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই সাথে এটি গরমের তাপও তুলনামূলক দ্রুত ছড়িয়ে দিতে পারে, যা তাপ ব্যবস্থাপনায় এর নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

এই নতুন প্রযুক্তি শুধু প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবেই নয়, বরং পরিবেশবান্ধব টেক্সটাইল, গ্রীন ইলেকট্রনিক্স, প্যাকেজিং, এমনকি শক্তি সংরক্ষণ (energy storage) উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এতে কোনো অতিরিক্ত স্ট্রেচিং বা পোস্ট-প্রসেসিংয়ের প্রয়োজন হয় না, ফলে উৎপাদন খরচও কম হয়।

ড. মাকসুদ রহমান বলেন, "আমরা ব্যাকটেরিয়াদের কাজকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত করছি। ফলে তারা সেলুলোজ এমনভাবে তৈরি করছে, যা কাঠামোগতভাবে সঠিক ও

শক্তিশালী। এটি ভবিষ্যতের পরিবেশবান্ধব উপকরণ তৈরিতে বিপ্লব আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।”

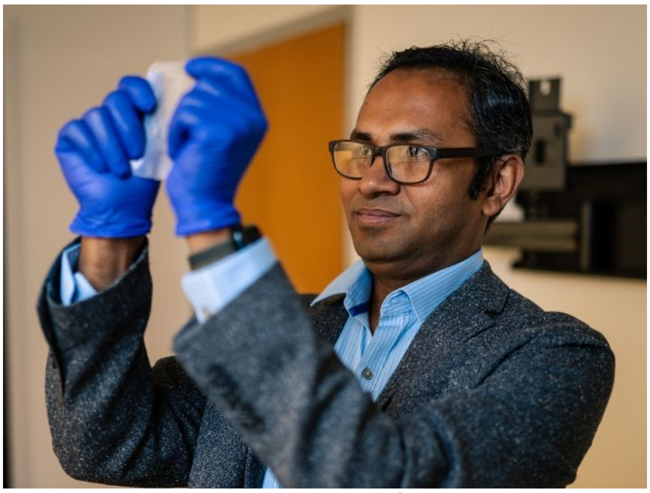

ব্যাকটেরিয়ার সেলুলোজ দিয়ে তৈরি বায়োপ্লাস্টিক হাতে ড. মাকসুদ রহমান। তিনি মনে করেন, এই শক্তিশালী, বহু-কার্যকর এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ শিট বিভিন্ন শিল্পে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং পরিবেশের ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে (University of Houston)

এই গবেষণার নেতৃত্বে থাকা ড. মাকসুদ রহমান বাংলাদেশের গর্ব। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে তাঁর প্রাথমিক উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে মেকানিক্যাল এবং অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

এই আবিষ্কার যেমন পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যও এটি হতে পারে একটি সাশ্রয়ী ও কার্যকর প্রযুক্তি। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যেখানে প্লাস্টিক দূষণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানেও এ প্রযুক্তির ব্যবহার একদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে, যদি আমরা সময়মতো এ উদ্ভাবনকে গ্রহণ ও প্রয়োগে সচেষ্ট হই।

লেখক: নুজহাত সুবাহ ঐশী

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41467-025-60242-1

জ্যোতির্বিজ্ঞান

খুঁজে পাওয়া গেল বেটেলজিউস-এর ‘সঙ্গী’ নক্ষত্রকে!

জ্যোতির্বিদেরা প্রথমবারের মতো বেটেলজিউসের একটি ক্ষুদ্র সঙ্গী নক্ষত্র সিওয়ারহা এর উপস্থিতির সরাসরি প্রমাণ পেয়েছেন। এই নক্ষত্রটির গঠন ও অবস্থান পূর্বাভাস অনুযায়ীই মিলে গেছে। এটি একটি বিরল ও মূল্যবান পর্যবেক্ষণ যা বেটেলজিউসকে ঘিরে থাকা অনেক রহস্যের সমাধান করছে এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ পর্যবেক্ষণে নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে।

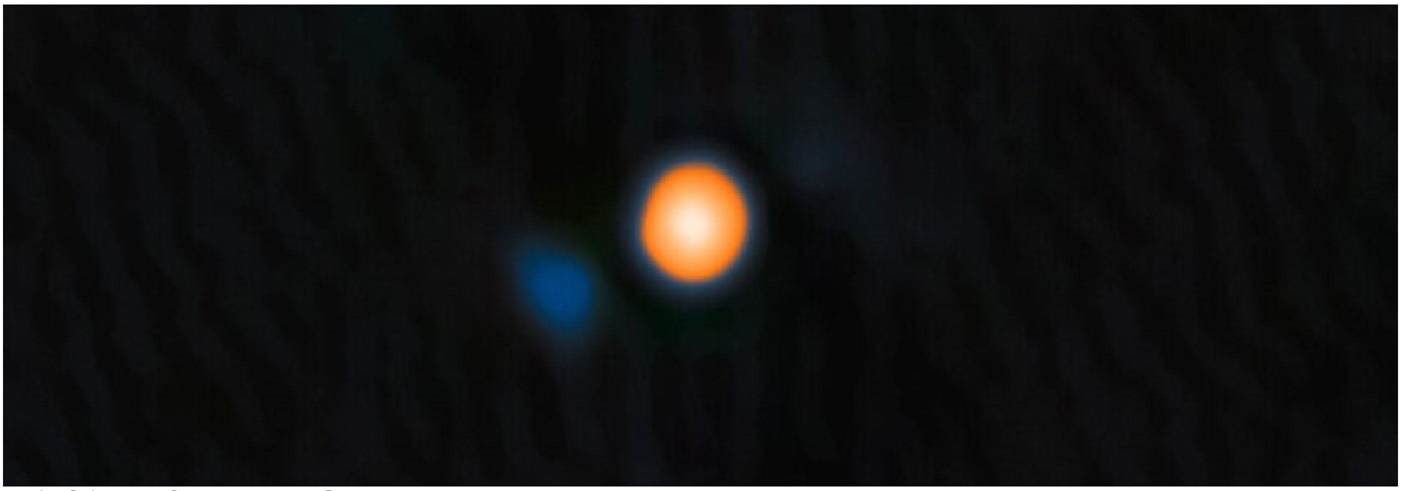

বেটেলজিউস (ডানদিকে) এবং এর সঙ্গী নক্ষত্র (বামে) [International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani]

কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলীতে অবস্থিত লাল দানব নক্ষত্র (Red Supergiant) বেটেলজিউস (Betelgeuse) সম্পর্কে বহুদিনের একটি রহস্য অবশেষে সমাধান হলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশেষে এর চারপাশে ঘুরতে থাকা একটি ছোট ও ম্লান সহচর/সঙ্গী নক্ষত্রর দেখা পেয়েছেন।

এই ক্ষীণ নক্ষত্রটির বৈশিষ্ট্য বেটেলজিউসের আচরণের ওপর ভিত্তি করে আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আরবিতে 'বেটেলজিউস' অর্থ 'দানবিনীর হাত'। তাই গবেষক দল প্রস্তাব করেছেন, এই সহচর নক্ষত্রটির নাম হোক সিওয়ারহা (Siwarha), অর্থাৎ 'তার চুড়ি'।

এই আবিষ্কার এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে অনেকে ভাবতেন, এটি কখনোই সম্ভব হবে না। তাই একে 'বিস্ময়কর সাফল্য' বলতেই হয়।

NASA Ames Research Center-এর জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভ হাওয়েল বলেন, "এটি ছিল জেমিনি টেলিস্কোপের হাই-অ্যাঙ্গুলার বিশ্লেষণক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে করা একটি পর্যবেক্ষণ, এবং এটা সফল হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে একই ধরনের আরও অনুসন্ধানের পথ খুলে গেল।"

আনুমানিক ৫৪৮ আলোকবর্ষ দূরে কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত বেটেলজিউস (বাংলা নাম আদ্রা) হলো আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল এবং বৃহৎ নক্ষত্র। এটি আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ১৬.৫ থেকে ১৯ গুণ ভারী এবং ব্যাস প্রায় ৭৬৪ গুণ।

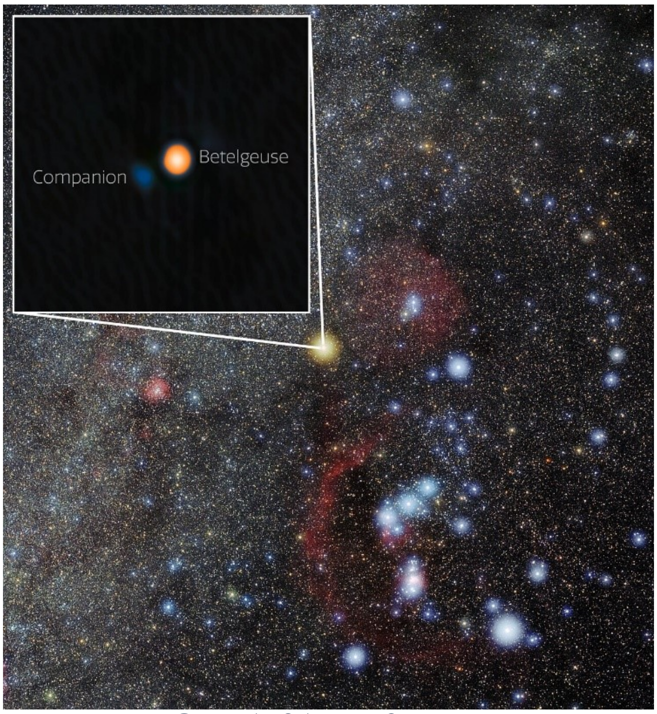

কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলীতে বেটেলজিউস এবং সিওয়ারহা-র অবস্থান (International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Zamani)

মাত্র ১ কোটি বছর বয়স হলেও এটি তার শেষ সময় পার করছে। কারণ বিশাল নক্ষত্ররা বেশি গরম ও উজ্জ্বল হয় এবং দ্রুত জ্বলে উঠে সুপারনোভা বিস্ফোরণে শেষ হয়। এই কারণেই বেটেলজিউস আমাদের নিকটবর্তী ও অল্পায়ু একটি নক্ষত্র যা বিস্ময়কর বিশ্লেষণের জন্য বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে মিলেছে অনেক অদ্ভুত তথ্যও। যেমন, ২০২০ সালের দিকে হঠাৎই বেটেলজিউসের আলো ৩৫ শতাংশ কমে গিয়েছিল, যা পরে বিশাল ধূলিকণার নির্গমনের ফল বলে প্রমাণিত হয়।

বেটেলজিউসের আলো আরও নানা সময়ে ওঠানামা করে। এর দুটি বড় আলো-চক্র আছে, একটি ৪০০ দিনে, অন্যটি ৬ বছরে একবার। প্রথমটি নক্ষত্রর ইন্টারনাল পালসেশনের কারণে, তবে দ্বিতীয়টি নিয়ে ছিল বিভ্রান্তি।

বিগত কয়েকটি (১, ২) গবেষণাপত্রে বলা হয়েছিল, একটি ক্ষুদ্র সহচর/সঙ্গী নক্ষত্র (আনুমানিক সূর্যের চেয়ে ১ থেকে ২ গুণ ভারী) এই ছয় বছরব্যাপী চক্রের জন্য দায়ী হতে পারে। তারা এমন পূর্বাভাসও দিয়েছিলেন যে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এটি দেখা যেতে পারে।

কিন্তু সমস্যা হলো, এত বড় ও উজ্জ্বল বেটেলজিউসের পাশে ছোট একটি ম্লান নক্ষত্র খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই গবেষকরা ব্যবহার করলেন স্পেকল ইমেজিং (speckle imaging) নামক একটি পদ্ধতি, যা খুব ছোট এক্সপোজার সময় ব্যবহার করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ডিসটর্শন দূর করে।

তাদের পাওয়া ফলাফল এখনও একেবারে নিশ্চিত নয় (১.৫ সিগমা), কিন্তু ঠিক পূর্বাভাস অনুযায়ীই ওই নক্ষত্রটিকে পাওয়া গেছে।

হাওয়েল এবং তাঁর দলের মতে, সিওয়ারহার ভর সূর্যের প্রায় ১.৬ গুণ, আর এটি বেটেলজিউস থেকে গড়ে ৪ অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিট (AU) দূরে ঘোরে অর্থাৎ সূর্য-পৃথিবীর দূরত্বের চারগুণ। এতে করে এর একবার আবর্তনে সময় লাগে প্রায় ৫.৯৪ বছর।

গবেষকরা বলেন, "এই ফলাফল নির্ধারক নয়, তবে বেটেলজিউসের একটি সঙ্গী নক্ষত্র থাকার ব্যাপারে এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং শক্তিশালী প্রমাণ।"

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সিওয়ারহা একটি F-টাইপ নক্ষত্র, যা এখনো মেইন সিকোয়েন্সে প্রবেশ করেনি অর্থাৎ এখনো এর কেন্দ্রে হাইড্রোজেন ফিউশন শুরু হয়নি।

যদিও বেটেলজিউস ও সিওয়ারহা সম্ভবত একই সঙ্গে জন্মেছিল, বিশালতার কারণে বেটেলজিউসের জীবন প্রায় শেষের পথে, আর সিওয়ারহার জীবন শুরুই হয়নি ঠিকমতো।

দুর্ভাগ্যবশত, হয়তো হবেই না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, আগামী ১ লাখ বছরের মধ্যে বেটেলজিউস সুপারনোভা বিস্ফোরণে ধ্বংস হবে এবং পেছনে একটি নিউট্রন তারা রেখে যাবে। সে সময় সিওয়ারহাও থাকবে সরাসরি তার বিপর্যয়রেখায়।

সিওয়ারহাকে আবারও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আসবে ২০২৭ সালের নভেম্বর মাসে। এর মধ্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেন তাদের প্রযুক্তি আরও উন্নত করতে হবে, যাতে আরও ভালোভাবে ধরা যায় এই রহস্যময় ও দূর্ভাগা নক্ষত্রটিকে।

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: *DOI: 10.3847/2041-8213/adeaaf*

স্বাস্থ্য

লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের জিন ও বয়সের প্রভাব

একটি বড় গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পরিবারের সব সন্তান একই লিঙ্গের (ছেলে বা মেয়ে), তাদের পরবর্তী সন্তানও সেই একই লিঙ্গের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মায়ের বয়স ও জিনগত বৈশিষ্ট্যও সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Jennie Hart/Alamy

একটি বড় পরিসরের গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পরিবারের সব সন্তান একই লিঙ্গের (শুধু ছেলে বা শুধু মেয়ে), তাদের পরবর্তী সন্তানও সেই একই লিঙ্গের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অর্থাৎ, যদি কারো তিনটি ছেলে থাকে, তাহলে চতুর্থ সন্তানও ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা ৬১%, আর যদি তিনটি মেয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী সন্তান মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ৫৮%।

এই ফলাফল আমাদের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে, যেখানে আমরা ভাবি প্রতিটি গর্ভধারণে ছেলে ও মেয়ে

হওয়ার সমান ৫০:৫০ সম্ভাবনা থাকে। গবেষক ও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালেক্স পলিয়াকভ বলেন, এই নতুন তথ্য অনুযায়ী, দম্পতিদের জানাতে হবে যে তারা যে লিঙ্গের সন্তান এখনো পায়নি, সেই লিঙ্গের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে ৫০ শতাংশেরও কম।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১৯৫৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৫৮,০০৭ জন মার্কিন নারী নার্সের সন্তানদের তথ্য বিশ্লেষণ করেন। এতে দেখা যায়, দুই সন্তানের পরিবারে ছেলে-মেয়ের মিশ্রণই বেশি দেখা যায়, কিন্তু তিন বা তার বেশি সন্তানের পরিবারে একই লিঙ্গের সন্তানই বেশি হয়। গবেষণায় শেষ সন্তানকে বাদ দেওয়া হয়েছে যাতে বাবা-মার সচেতন সন্তান নির্বাচন (যেমন ছেলে-মেয়ে দুটিই পেয়ে গেছেন বলে সন্তান নেওয়া বন্ধ করেছেন) গবেষণার ফলকে প্রভাবিত না করে।

এছাড়া দেখা যায়, যারা ২৯ বছর বা তার বেশি বয়সে প্রথম সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তাদের মধ্যে শুধু ছেলে বা শুধু মেয়ে সন্তানের সম্ভাবনা ১৩% বেশি ছিল তুলনামূলকভাবে ২৩ বছরের কম বয়সীদের চেয়ে। গবেষকরা মনে করছেন, বয়স বাড়ার সাথে মহিলাদের শরীরের pH পরিবর্তনের কারণে Y বা X ক্রোমোজোমের স্পার্মের সফলতা ভিন্ন হতে পারে, যার ফলে সন্তানের লিঙ্গে প্রভাব পড়ে।

জিন-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কিছু নারীর শরীরে এমন দুটি সাধারণ জিনগত পরিবর্তন থাকে, যা একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান হওয়ার প্রবণতা বাড়ায়। NSUN6 নামের একটি জিনের পরিবর্তন মেয়ে সন্তানের সম্ভাবনা বাড়ায়, আর TSHZ1 নামের একটি জিনের পাশে থাকা এক অক্ষরের পরিবর্তন ছেলে সন্তানের সম্ভাবনা বাড়ায়।

তবে এই গবেষণায় পুরুষ সঙ্গীদের প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। পলিয়াকভ বলেন, বর্তমান সময়ে কম সন্তান নেওয়ার প্রবণতার কারণে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করে এ ধরনের গবেষণা করা কঠিন হবে।

গবেষণার সহ-লেখক এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী সিউয়েন ওয়াং বলেন, ভবিষ্যতে আরও গবেষণা দরকার যাতে মাতৃবয়স ও অন্যান্য জৈবিক প্রভাবগুলো বিস্তারিতভাবে বোঝা যায়। যেমন, নারীদের হরমোনের পরিবর্তন বা পিতার বয়সের ভূমিকা এখানে থাকতে পারে।

সবশেষে গবেষকরা সাবধান করেন যে, এই ফলাফল ব্যক্তিগতভাবে কার ছেলে বা মেয়ে হবে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে না। তাই সন্তান লিঙ্গ নির্ধারণের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য এ তথ্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

লেখক: সাফিয়া তাবাসসুম রুমু

রেফারেন্স: *DOI: 10.1126/sciadv.adu7402*

সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞানবার্তা

@bigganbartafb @bigganbarta @bigganbarta @bigganbarta

জ্যোতির্বিজ্ঞান

মহাবিশ্বের শীতলতম স্থান

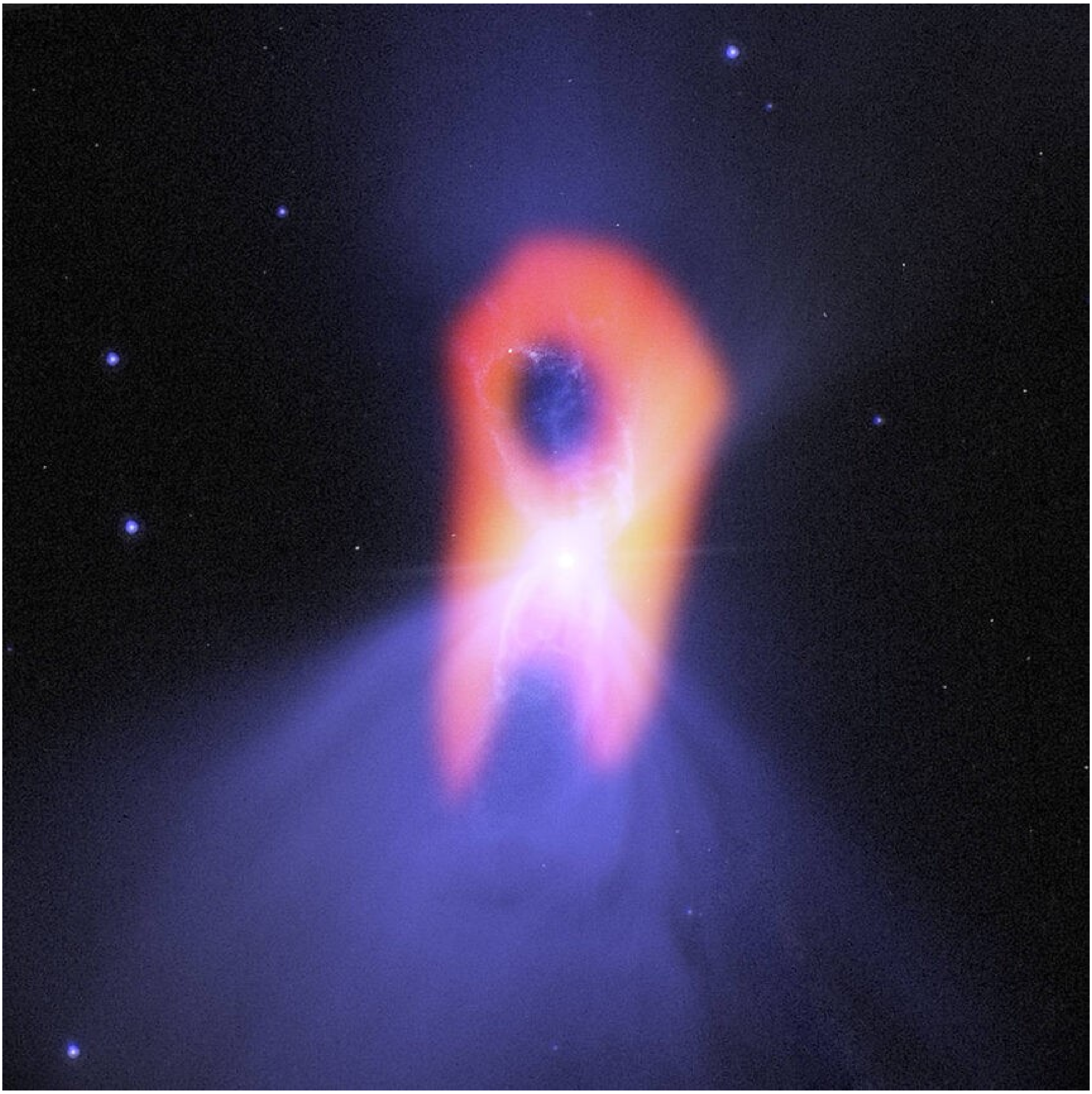

বুমেরাং নীহারিকা, যাকে "মহাবিশ্বের সবচেয়ে শীতল স্থান" বলা হয়। ALMA টেলিস্কোপের এর আসল আকৃতি প্রকাশ। পেছনের নীল গঠনটি হাবল স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে দৃশ্যমান আলোতে তোলা হয়েছে (NRAO/AUI/NSF/NASA/STScI/JPL-Caltech)

পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা বা শীতলতম স্থান হলো অ্যান্টার্কটিকার পূর্ব মালভূমি (East Antarctic Plateau)। এই অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট উচ্চভূমি ও হ্রদ-আকৃতির নিম্নভূমিতে স্যাটেলাইট ডেটার মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা যা প্রায় −৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২০০৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ করা উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

তবে এই −৯৮°C ছিল বরফের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, যা স্যাটেলাইট থেকে পরিমাপ করা হয়। বাস্তবে সেখানে বাতাসের তাপমাত্রা কিছুটা বেশি, তবে তখনও তা −৯৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মতো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব অ্যান্টার্কটিক মালভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম স্থান (Ted Scambos, NSIDC/University of Colorado-Boulder)

এর আগে মানুষের দ্বারা সরাসরি পরিমাপকৃত সবচেয়ে কম বায়ুর তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিলো ২১ জুলাই, ১৯৮৩ সালে, রাশিয়ার Vostok স্টেশন-এ যা ছিলো −৮৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে এক গবেষণা বলছে উপযুক্ত আবহাওয়া ও পরিবেশগত শর্ত পূরণ হলে রাশিয়ার ভোস্টক স্টেশনে তাপমাত্রা আরও কমে যেতে পারে। এমনকি সেখানে সম্ভাব্য রেকর্ড তাপমাত্রা হতে পারে মাইনাস −৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই তীব্র মাত্রার শীতল পরিবেশে প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব টিকে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে এটিই কিন্তু আমাদের সোলার সিস্টেমের একমাত্র সবচেয়ে ঠান্ডা স্থান নয়।

অনেকে মনে করেন যে, সূর্য বা অন্য কোন নক্ষত্র থেকে সবচেয়ে দূরের বস্তু বা গ্রহেই হয়ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করে। যেমন, আমাদের সোলার সিস্টেমের শেষের অংশ কুইপার বেল্টে অবস্থিত বামন গ্রহ প্লুটোর পৃষ্ঠতলের গড় তাপমাত্রা প্রায় ৪১ কেলভিন বা –২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, দূরবর্তী প্লুটোর থেকেও বেশি ঠান্ডা স্থান আমাদের উপগ্রহ চাঁদের বুকে লুকিয়ে রয়েছে।

২০০৯ সালে NASA-এর Lunar Reconnaissance Orbiter মিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত কিছু গর্ত, যেমন হারমাইট ক্র্যাটার (Hermite Crater)-এ সূর্যের আলো কখনোই পৌঁছায় না। এই গর্তগুলোর অভ্যন্তরে তাপমাত্রা হতে পারে প্রায় –২৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা প্রায় ২৬ কেলভিন। যা নিশ্চিতভাবেই প্লুটোর থেকেও অনেক বেশি শীতল স্থান বলা চলে।

ওর্ট ক্লাউড (Oort Cloud)-কে নাসা একদিকে আমাদের সৌরজগতের “সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চল” হিসেবে বিবেচনা করে, আবার অন্যদিকে বলে এটি “সৌরজগতের বাইরের” অংশ। এই অস্পষ্টতার কারণে কখনো একে সৌরজগতের অংশ হিসেবে ধরা হয়, আবার কখনো একে সৌরজগত ও আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশের সীমানা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যদি ওর্ট ক্লাউড কে সৌরজগতের অংশি হিসাবে ধরা হয় তাহলে আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে শীতল ও রহস্যময় অঞ্চল হচ্ছে ওর্ট ক্লাউড (Oort Cloud)। এটি সূর্য থেকে প্রায় ২,০০০–১,০০,০০০ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট (AU) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকতে পারে। এখানে গড় তাপমাত্রা প্রায় ৪.১৫ কেলভিন বা –২৬৮.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মহাবিশ্বের কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশনের তাপমাত্রা (~২.৭ কেলভিন)-র কাছাকাছি অর্থাৎ হাইড্রোজেনের ফ্রিজিং পয়েন্টের প্রায় কাছাকাছি।

যদি ওর্ট ক্লাউড কে সৌরজগতের বাইরে হিসাবে ধরা হয় তাহলে হয়তো চাঁদের হারমাইট ক্র্যাটার-ই হয়তো সৌরজগতের এখন পর্যন্ত রেকর্ডেট সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য হলো যে, সৌরজগতের বাহিরে আমাদের চীরচেনা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভেতরই এমন রহস্যময় স্থান রয়েছে, যাকে এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান সবচেয়ে শীতল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন বুমেরাং নীহারিকা (Boomerang Nebula)। এটি পৃথিবী থেকে

প্রায় ৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, Centaurus নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত।

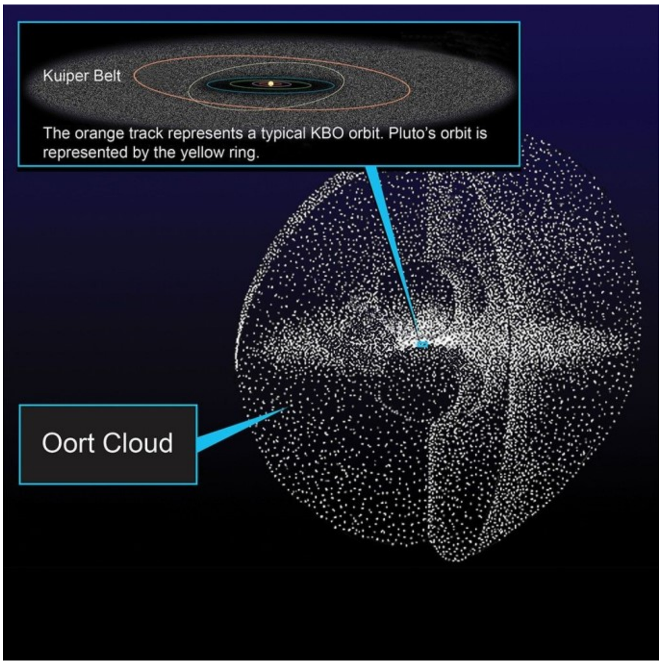

আমাদের সৌরজগতের সাথে সম্পর্কিত কুইপার বেল্ট এবং ওর্ট ক্লাউডের একটি ইলাস্ট্রেশন যেটি নাসা ২০০৯ সালে প্রকাশ করে (NASA/JPL)

এটি একটি প্রোটোপ্ল্যানেটারি নেবুলা এবং যার কেন্দ্রে একটি মৃতপ্রায় তারা তার বাইরের গ্যাস স্তর বিপুল বেগে ছুঁড়ে ফেলছে। ফলে নীহারিকাটির অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পৌঁছে গেছে প্রায় –২৭২.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ১৯৯৫ সালে NASA-র হাবল টেলিস্কোপ ও মাইক্রোওয়েভ ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারেন বিজ্ঞানীরা এবং পরবর্তীতের ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) থেকেও এটি নিশ্চিত করেন তাঁরা।

বুমেরাং নীহারিকা (Boomerang Nebula) প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯৮০ সালে। দুইজন অস্ট্রেলিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Keith Taylor ও Mike Scarrott চিলির লাস ক্যাম্পানাস অবজারভেটরি থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণের সময় এই বিশেষ আকৃতির অতিশীতল নীহারিকাটি শনাক্ত করেন। তবে এটিকে প্রথমে এর অদ্ভুত, বুমেরাং-এর মতো গঠন দেখে এমন নাম দেওয়া হয়েছিল বুমেরাং নেবুলা।

তবে এটি হয়তো শেষ কথা নয়। ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষেরও বেশি বিস্তৃত আমাদের মহাবিশ্বে বুমেরাং নীহারিকার থেকেও ঠাণ্ডা কোনো অঞ্চল কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে। আজকের প্রযুক্তি দিয়ে হয়তো তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বিজ্ঞানের অনুসন্ধান থেমে নেই। গবেষকরা নিরবিচারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, হয়তো একদিন পাওয়া যাবে নতুন কোনো "সর্বাধিক শীতল" বিস্ময়ের সন্ধান।

লেখক: সিরাজুর রহমান
শিক্ষক, বিনগ্রাম উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংড়া, নাটোর

প্রত্নতত্ত্ব

লাতিন লেখার রহস্যভেদে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

প্রাচীন লাতিন লেখার উৎস, বয়স ও হারানো অংশ পুনর্গঠনে গবেষকেরা ‘এনিয়াস’ নামের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল তৈরি করেছেন। এটি ইতিহাসবিদদের তুলনায় অনেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য এটি একটি কার্যকর সহায়ক টুল হতে পারে।

The Metropolitan Museum of Art/Yannis Assael et al.

বিজ্ঞানীরা এমন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) মডেল তৈরি করেছে যা প্রাচীন লাতিন লেখার উৎস শনাক্তকরণ, তাদের বয়স অনুমান এবং হারিয়ে যাওয়া অংশ পুনর্গঠন করতে সক্ষম। এই মডেলটির নাম Aeneas (এনিয়াস) যা গ্রিক-রোমান মিথোলজির ট্রোজেন হিরোর নামে রাখা হয়েছে। নতুন এই এআই সম্পর্কিত গবেষণাপত্রটি ২৩ জুলাই, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত হয়। এটি তৈরি করেছেন সেই গবেষক দল, যাঁরা আগে প্রাচীন গ্রীক লিপি পড়ার জন্য এআই তৈরি করেছিলেন।

প্রাচীন লেখাগুলো নিয়ে কাজ করা খুব কঠিন, কারণ অনেক সময়ই লেখার অংশবিশেষ মুছে গেছে বা ভাষার গঠনকাঠামো বদলে গেছে। ইতিহাসবিদরা সাধারণত মিলিয়ে-মিশিয়ে অন্য লেখার সঙ্গে তুলনা করে লেখার মানে বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ থিয়া সোমারশিল্ড।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাতিন ভাষাবিদ অ্যান রজারসন বলেন, নতুন নতুন লিপি প্রতিনিয়ত আবিষ্কৃত হচ্ছে, ফলে এত বিশাল তথ্য একা কোনো মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

এই সমস্যা দূর করতে যুক্তরাজ্য ও গ্রিসের গবেষকরা এবং গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমান কোম্পানি DeepMind মিলে তৈরি করেছেন Aeneas নামের একটি জেনারেটিভ এআই

মডেল। মডেলটিকে প্রাচীন লাতিন লিপির তিনটি বড় ডেটাবেজের তথ্য দিয়ে ট্রেইন করানো হয়েছে। মডেলটি প্রায় ১,৭৬,৮৬১টি লিপি এবং তার মধ্যে ৫% চিত্রসহ ব্যবহার করেছে। সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত।

Aeneas মূলত তিনটি নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে গঠিত, প্রতিটিই আলাদা কাজে ব্যবহৃত হয়:

১. হারিয়ে যাওয়া লেখার অংশ পূরণ

২. লেখার ভৌগোলিক উৎস নির্ধারণ

৩. লেখার সময়কাল অনুমান

এছাড়াও Aeneas প্রতিটি ফলাফলের সঙ্গে মিলযুক্ত আরও কিছু লিপির তালিকা দেয়, যা প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে সাজানো থাকে।

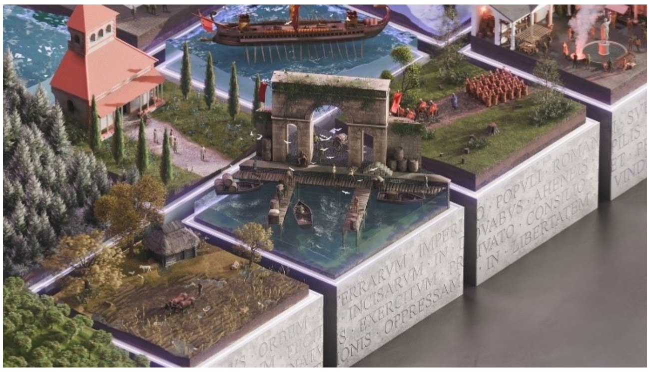

বিখ্যাত রোমান যুগের শিলালিপি, রেস গেস্টা ডিভি অগাস্টি (Res Gestae Divi Augusti)-এর ভাষা বিশ্লেষণ (Robbe Wulgaert/DeepMind)

গুগল ডিপমাইন্ডের গবেষক ইয়ানিস আসায়েল বলেন, "আমাদের ডেটাসেটে প্রতিটি লিপির একটি স্বতন্ত্র আইডি থাকায় Aeneas তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক লেখাগুলো খুঁজে বের করতে পারে।"

মডেলটির কার্যকারিতা যাচাই করতে ২৩ জন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে কিছু লেখার অপূর্ণ অংশ পূরণ করানো হয়, কিছুক্ষেত্রে লেখার সময় ও উৎস অনুমান করতেও বলা হয়। একবার মডেল ছাড়া, আরেকবার মডেলের সহায়তায়। দেখা গেছে, বিশেষজ্ঞরা নিজেরা গড়পড়তায় ±৩১ বছরের মধ্যে সময় অনুমান করলেও, Aeneas ±১৩ বছরের মধ্যে সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে।

লিপির উৎস ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, যখন বিশেষজ্ঞরা মডেলের দেওয়া প্রাসঙ্গিক লেখাগুলোর তালিকা ও পূর্বাভাস পেয়েছেন, তখন তারা আরও সঠিকভাবে কাজটি করতে পেরেছেন। তখন সময় নির্ধারণের গড়পড়তা ত্রুটি নেমে এসেছে মাত্র ±১৪ বছরে।

এই মডেলটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিখ্যাত *Res Gestae Divi Augusti* লেখার ওপর, যেটি রোমান সম্রাট অগাস্টাসের জীবন কাহিনি। মডেলটি বয়স অনুমানে ইতিহাসবিদদের মতোই নির্ভুল ফল দিয়েছে এবং লেখার মধ্যে উল্লেখিত ভুল তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়নি। বানান ও রীতির পার্থক্যও ধরতে পেরেছে।

আরেকটি পরীক্ষায়, একটি বেদিতে খোদাই করা লেখার উৎস শনাক্ত করার সময় মডেলটি কাছাকাছি অঞ্চলের একটি আরেকটি বেদি তুলে ধরে, যদিও তাকে এটি শেখানো হয়নি। এটি গবেষকদের কাছে বিস্ময়কর লেগেছে।

রজারসন বলেন, "এই মডেল এমন বিশাল তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে যা একক কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি ইতিহাসবিদদের জন্য সহায়ক, বিশেষ করে যখন কেউ নতুন লেখার সঙ্গে মিল থাকা লেখাগুলো খুঁজতে চান। এ কাজটি সাধারণত সপ্তাহ বা মাসজুড়ে চলে।"

তিনি আরও বলেন, "Aeneas যেসব অনুমান দেয়, তা অন্যান্য জনপ্রিয় AI-এর চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিনির্ভর। এটি র‍্যান্ডম কিছু বলছে না, বরং ডাটাবেইসের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছে।"

তবে Aeneas-এর একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর প্রশিক্ষণ ডেটাবেজ অন্যান্য বড় AI মডেলের তুলনায় ছোট। ফলে খুব দুর্লভ বা অনন্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রে এটি ততটা কার্যকর নাও হতে পারে। বিশেষ করে এমন সময়কাল থেকে আসা লেখাগুলোর ক্ষেত্রে, যার নমুনা খুব কম পাওয়া যায়।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09292-5*

করোনাকালে মস্তিষ্ক দ্রুত বৃদ্ধ হয়েছে

গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯ মহামারির সময় মানুষের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকের তুলনায় দ্রুত বার্ধক্যের দিকে এগিয়েছে। এই প্রভাব ভাইরাস সংক্রমণের চেয়ে বেশি ছিল মানসিক চাপ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অর্থনৈতিক অসাম্যর কারণে। বিশেষত, পুরুষ এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ওপর প্রভাব ছিল বেশি।

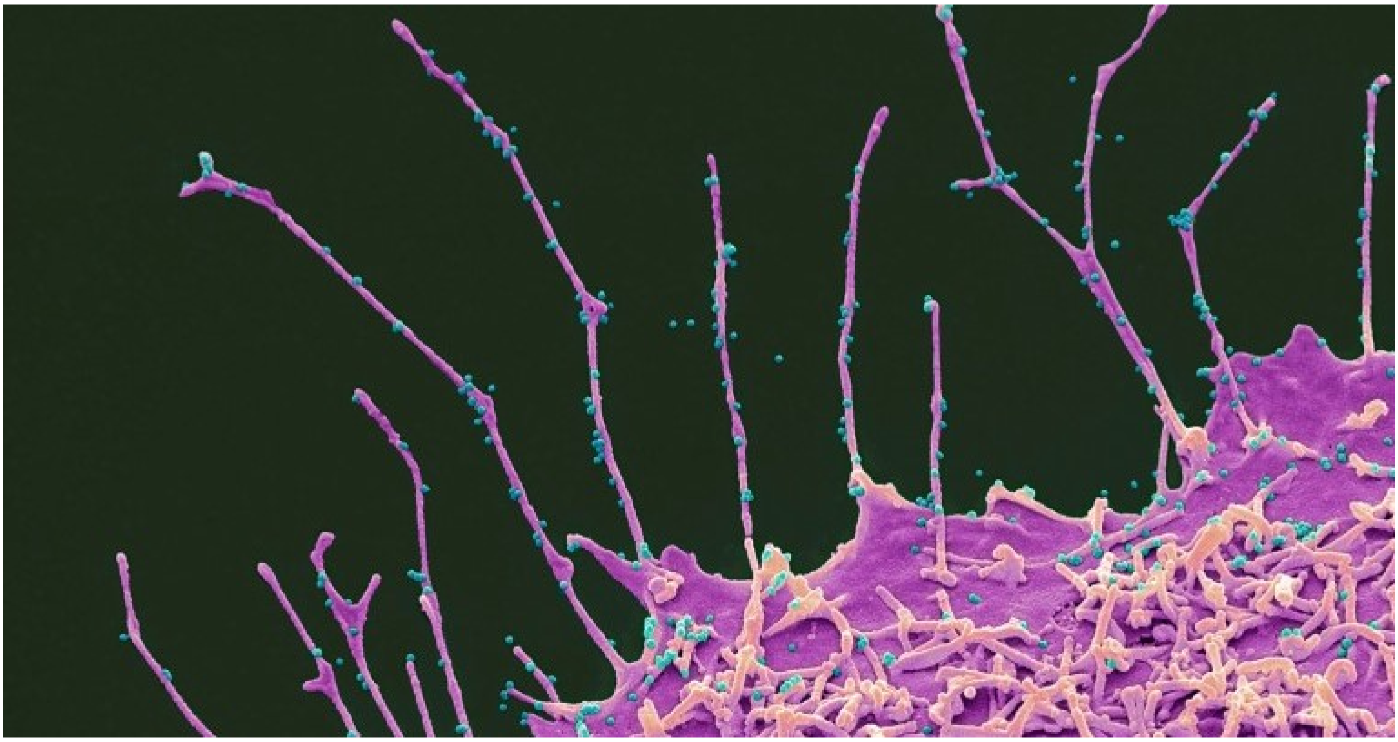

Steve Gschmeissner/Science Photo Library

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় মানুষের মস্তিষ্ক স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক দ্রুত বার্ধক্যের পথে এগিয়েছে। শুধু ভাইরাস সংক্রমণ নয়, বরং মহামারিজনিত সামাজিক ও মানসিক চাপও এই পরিবর্তনের মূল কারণ হতে পারে।

যুক্তরাজ্যের ইউকে বায়োব্যাংক প্রকল্পের ১৫,০০০-এর বেশি মানুষের এমআরআই স্ক্যান বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা একটি 'ব্রেইন এজ প্রেডিকশন মডেল' তৈরি করেছেন, যা মস্তিষ্কের বয়স অনুমান করতে পারে। পরে এই মডেল প্রয়োগ করা হয় ৯৯৬ জন মানুষের উপর, যাদের কেউ কেউ মহামারির আগে এবং পরে স্ক্যান করিয়েছেন (Pandemic group) এবং অন্যরা মহামারির আগেই দুইবার স্ক্যান করিয়েছেন (Control group)।

ফলাফল বলছে, যেসব মানুষ মহামারির সময় স্ক্যান করিয়েছেন, তাদের মস্তিষ্কের বার্ধক্য গড়পড়তায় ৫.৫ মাস বেশি বেড়েছে, যা একরকম "মস্তিষ্কের সময়ের সাথে ছুটে চলা"র ইঙ্গিত দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই পরিবর্তনটি দেখা গেছে যারা কোভিডে আক্রান্ত হননি, তাদের মধ্যেও।

বিশেষভাবে, পুরুষ এবং যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত তাদের ক্ষেত্রে এই বার্ধক্যের হার ছিল আরও তীব্র। তবে, শুধুমাত্র কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখা গেছে মস্তিষ্কের এই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু কগনিটিভ (জ্ঞানতাত্ত্বিক) দক্ষতা (বিশেষ করে চিন্তার নমনীয়তা ও কাজের গতি) ক্ষীণভাবে হ্রাস পেয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, এই প্রবণতা শুধু ভাইরাসের কারণে নয়, বরং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হওয়া, এবং মানসিক চাপ ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে ঘটেছে। এ প্রেক্ষাপটে, মস্তিষ্কের বার্ধক্য শুধুই একটি জৈবিক বিষয় নয়; বরং এটি সামাজিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

এই গবেষণা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, জনস্বাস্থ্য সংকট শুধু শারীরিক নয়, মানসিক এবং স্নায়বিক দিক

থেকেও দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব ফেলে। আগামী দিনে মহামারি-পরবর্তী স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণে এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

লেখক: সায়মা ইয়ানা

রেফারেন্স: DOI: [10.1038/s41467-025-61033-4](https://doi.org/10.1038/s41467-025-61033-4)

পদার্থবিজ্ঞান

অ্যালুমিনিয়ামের নতুন আইসোটোপ আবিষ্কার

অ্যালুমিনিয়াম-২০ নামক একটি অতি হালকা ও অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস থেকে প্রথমবারের মতো তিন-প্রোটন বিকিরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে বিরল এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা নিউক্লিয়াসের গঠন ও বিকিরণের নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ৩,৩০০ এরও বেশি নিউক্লাইড শনাক্ত করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৩০০-এরও কম প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে স্থিতিশীল। বাকিগুলো অস্থিতিশীল এবং রেডিওঅ্যাকটিভ বিকিরণের মাধ্যমে ভেঙে পড়ে।

২০শ শতকের মাঝামাঝি সময়েই α বিকিরণ, β^- বিকিরণ, β^+ বিকিরণ, ইলেকট্রন ক্যাপচার, γ বিকিরণ এবং নিউক্লিয়ার ফিশন-এর মতো সাধারণ বিকিরণ প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কৃত হয়।

তবে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গবেষণার সুবিধা এবং ডিটেকশন প্রযুক্তির চমৎকার উন্নতির কারণে বিজ্ঞানীরা এমন সব বিরল বিকিরণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন, যা সাধারণ স্থিতিশীল পরমাণুর বাইরে অবস্থিত নিউক্লিয়াস, বিশেষ করে নিউট্রন-ঘাটতিপূর্ণ নিউক্লিয়াসগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

১৯৭০-এর দশকে বিজ্ঞানীরা একক প্রোটন বিকিরণ (single-proton radioactivity) শনাক্ত করেন, যেখানে নিউক্লিয়াস একটিমাত্র প্রোটন নিঃসরন করে ভেঙে পড়ে।

এরপর ২১শ শতকে দ্বি-প্রোটন বিকিরণ (two-proton radioactivity) দেখা যায় কিছু অত্যন্ত নিউট্রন-ঘাটতিপূর্ণ নিউক্লিয়াসে।

আর খুব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিজ্ঞানীরা আরও বিরল বিকিরণ যেমন, তিন, চার এবং পাঁচ প্রোটন নিঃসরন পর্যবেক্ষণ করেছেন।

চীনা একাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ফিজিক্স-এর পদার্থবিদ ড. জিয়াওডং শু বলেন, "অ্যালুমিনিয়াম-২০ হলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে হালকা অ্যালুমিনিয়াম আইসোটোপ।"

তিনি আরও জানান, এই আইসোটোপ প্রোটন ড্রিপ লাইনের বাইরের দিকে অবস্থিত এবং এটি স্থিতিশীল অ্যালুমিনিয়াম আইসোটোপের তুলনায় সাতটি কম নিউট্রন ধারণ করে।

জার্মানির GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research-এর ফ্র্যাগমেন্ট সেপারেটরে ইন-ফ্লাইট ডিকেই পদ্ধতি ব্যবহার করে, বিজ্ঞানীরা অ্যালুমিনিয়াম-২০ এর বিকিরণজাত কণাগুলোর কোণীয় সম্পর্ক (angular correlations) বিশ্লেষণ করেন।

"অ্যালুমিনিয়াম-২০ হলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে হালকা অ্যালুমিনিয়াম আইসোটোপ"

এই বিশ্লেষণ থেকে তারা দেখতে পান, অ্যালুমিনিয়াম-২০ প্রথমে একটি প্রোটন নিঃসরন করে ম্যাগনেসিয়াম-১৯ আইসোটোপে রূপান্তরিত হয়, যা পরবর্তীতে একসাথে দুইটি প্রোটন নিঃসরন করে।

অতএব, অ্যালুমিনিয়াম-২০ হলো প্রথম তিন-প্রোটন বিকিরণকারী আইসোটোপ, যার এক-প্রোটন বিকিরণজাত নিউক্লিয়াস নিজেই দুই-প্রোটন বিকিরণ করে।

তারা আরও দেখতে পান, অ্যালুমিনিয়াম-২০ এর ভিত্তিস্থান (ground state) থেকে বিকিরণজনিত শক্তি আইসোস্পিন সিমেট্রির অনুমানকৃত মানের চেয়ে

উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যা আইসোস্পিন সিমেট্রি ভাঙনের (symmetry breaking) ইঙ্গিত দেয় এবং তার মিরর পার্টনার নিয়ন-২০ এর সঙ্গেও পার্থক্য দেখা যায়।

অ্যালুমিনিয়াম-২০ এবং নিয়ন-২০ এর ground state-এর spin-parity যে এক নয় সেটা সমর্থন করে।

ড. শু বলেন, "এই গবেষণা প্রোটন বিকিরণ সংক্রান্ত আমাদের বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং প্রোটন ড্রিপ লাইনের বাইরের নিউক্লিয়াসগুলোর গঠন ও বিকিরণ প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে।"

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

রেফারেন্স: DOI: 10.1103/hkmy-yfdk

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বার্ন রোগীদের ক্ষতে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে

ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে সংগ্রহ করা Pseudomonas aeruginosa জীবাণুর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এর অধিকাংশই এক্সটেন্সিভলি ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্স (XDR)। এছাড়াও এরা বায়োফিল্ম তৈরি ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন বহন করে। গবেষণায় জিনোমিক বিশ্লেষণ থেকে এই জীবাণুর বিপজ্জনক প্রতিরোধ ক্ষমতা ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে, যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

Jennifer Oosthuizen/CDC

পোড়া রোগীদের শরীর শুধু বাহ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এই ক্ষতের ভিতরেও বাসা বাঁধে প্রাণঘাতী জীবাণু। সম্প্রতি বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রোগীদের পোড়া ক্ষত থেকে সংগ্রহ করা *Pseudomonas aeruginosa* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বিস্ময়কর জেনেটিক এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এবং গবেষণাপত্রটি গত ১৫ জুলাই, ২০২৫ এ *Scientific Reports* এ প্রকাশিত হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা গেছে, ৮ মাসে ৯১টি পোড়া ক্ষত থেকে সংগৃহীত *P. aeruginosa* জীবাণুর মধ্যে ৬১টি ছিল এক্সটেন্সিভলি ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্স (XDR) এবং বাকি ৩০টি ছিল মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্স (MDR)। অধিকাংশ জীবাণু ছিল এমন ধরনের, যেগুলো প্রায় সব প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

গবেষকরা এসব জীবাণুর মধ্যে একাধিক বেটা-ল্যাকটামেজ উৎপাদনকারী জিন যেমন blaNDM-1, blaVIM-2, blaOXA-48 এবং blaPER-1 চিহ্নিত করেছেন। এই জিনগুলো অ্যান্টিবায়োটিককে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে, ফলে চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু, ইন্টিগ্রন নামক জিনগত কাঠামোর উপস্থিতি এসব জিনকে একত্রে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সবগুলো জীবাণু বায়োফিল্ম তৈরি করতে সক্ষম, যেটি একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার আবরণ তৈরি করে। গবেষণায় pelB, pilT এবং rhlB নামক বায়োফিল্ম-সম্পর্কিত জিনগুলোর উচ্চ উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে।

দুইটি প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার সম্পূর্ণ জিনোম বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখতে পান প্রতিটি জীবাণু অন্তত ২৮ থেকে ৫০টি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধী জিন বহন করে। পাশাপাশি, একাধিক Efflux Pump (যেগুলো জীবাণু কোষ থেকে ওষুধ বের করে দেয়) এবং Prophage (ভাইরাস থেকে সংক্রমিত জিন) এর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এমনকি জীবাণুর জিনোমে ডিসইনফেক্ট্যান্ট প্রতিরোধী জিন (qacL, qacDelta1) পাওয়া গেছে, যা জীবাণুদের হাসপাতালের জীবাণুনাশক থেকেও রক্ষা করে।

গবেষণাটি একটি ভয়াবহ বাস্তবতা তুলে ধরে। বাংলাদেশের হাসপাতাল, বিশেষ করে বার্ন ইউনিটগুলোতে এমন অত্যাধুনিক জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে, যা প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ। বিশ্বজুড়ে *P. aeruginosa*-এর সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়ানো সিকোয়েন্স টাইপ ST235, যা এই গবেষণাতেও লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ, এই জীবাণুর ধরন বাংলাদেশেও একইভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

গবেষণাটি আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, বাংলাদেশের মতো দেশে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, উন্নত জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও জেনেটিক পর্যবেক্ষণ এখন আর বিলাসিতা নয়—বরং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।

এই গবেষণার ফলাফল কেবল বিজ্ঞানীদের নয়, চিকিৎসা নীতিনির্ধারকদের জন্যও একটি সতর্কবার্তা। যদি সময় মতো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে হাসপাতালে চিকিৎসা আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41598-025-11614-6*

বাংলাদেশ

সোনালী মুরগির মাংসে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণু!

নরসিংদী জেলার কিছু বাজার থেকে সংগৃহীত সোনালী মুরগির মাংসে উচ্চমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী E. coli জীবাণু পাওয়া গেছে। এদের অনেকগুলোতে ESBL, AmpC ও NDM-1 টাইপ জিন একত্রে বিদ্যমান, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। নিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে এখনই প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার ছয়টি উপজেলায় বাজার থেকে সংগ্রহ করা সোনালী মুরগির মাংসের নমুনায় পাওয়া গেল বিপজ্জনক মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী *Escherichia coli* জীবাণু। গত ১৪ জুলাই, ২০২৫ *Scientific Reports* জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এসব মাংস থেকে বিচ্ছিন্ন *E. coli*-র মধ্যে অনেকগুলোই বহুধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, বিশেষ করে বিটা-ল্যাকটাম শ্রেণির অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে। গবেষকরা ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নমুনা সংগ্রহ করেন।

৩৯০টি মাংসের নমুনা থেকে ৬৮% ক্ষেত্রে *E. coli* শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮% ছিল মানবদেহে ডায়রিয়াসহ নানা অন্ত্রঘটিত রোগের জন্য দায়ী enteropathogenic *E. coli* (EPEC)। বাকি ৯২% ছিল non-EPEC, যারা তুলনামূলক কম পরিচিত হলেও

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের দিক থেকে বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৪২% *E. Coli* ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) উৎপাদনকারী অর্থাৎ এরা সেফট্রিয়াক্সন, সেফটোজিডিমের মতো তৃতীয় প্রজন্মের সেফালোস্পোরিন গুলোকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে। আরও ভয়ংকর বিষয় হলো, কিছু জীবাণুতে একাধিক প্রতিরোধী জিন যেমন blaTEM, blaCTX-M-2a, ও blaOXA-1 একসাথে পাওয়া গেছে। আবার ৯% জীবাণুতে পাওয়া গেছে blaNDM-1 জিন, যা শক্তিশালী কার্বাপেনেম অ্যান্টিবায়োটিককেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে, এই জিন সাধারণত হাসপাতাল-সংশ্লিষ্ট গুরুতর সংক্রমণের জন্য দায়ী।

গবেষণাটি আরও দেখায় যে, এসব জীবাণুর মধ্যে ১০০% ছিল অ্যাম্পিসিলিনে সম্পূর্ণ প্রতিরোধী। এছাড়া ইরিথ্রোমাইসিন, কো-ট্রাইমোক্সাজল, ও তৃতীয় প্রজন্মের সেফালোসপরিনের প্রতিও উচ্চমাত্রায় প্রতিরোধ দেখা গেছে। তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম প্রতিরোধ দেখা গেছে অ্যামোক্সিসিলিন-ক্ল্যাভুলানেট ও সিপ্রোফ্লক্সাসিনের বিরুদ্ধে।

গবেষকদের মতে, এ ধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) প্রাণিজ উৎপাদনে অতি মাত্রায় ও অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফল। সঠিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে এসব প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে পৌঁছে যেতে পারে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এবং একবার যদি মানবদেহে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাধারণ সংক্রমণের চিকিৎসাও হয়ে পড়তে পারে দুঃসাধ্য।

এই গবেষণাটি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি জোরালো সতর্কবার্তা। গবেষকরা বেশ কিছু দিক থেকে সতর্ক হবার কথা বলছেন। বিশেষ করে মুরগি উৎপাদনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কড়া নিয়ন্ত্রণমালা। এছাড়াও খামার থেকে বাজার পর্যন্ত সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সারা দেশে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু সহ "One Health" দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশকে একসাথে বিবেচনা করে নীতিমালা প্রণয়ন করার কথাও বলেছেন।

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41598-025-96073-9*

স্বাস্থ্য

চোখে দেখলেই প্রস্তুত হয় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে VR-এর মাধ্যমে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে দেখালেই তার মস্তিষ্ক এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, যেন শরীরে সংক্রমণ ঘটেছে। এতে শরীরের প্রাথমিক রোগপ্রতিরোধ কোষ সক্রিয় হয়। গবেষণাটি দেখায়, VR ও মস্তিষ্কের যৌথ প্রভাব ভবিষ্যতে ভ্যাকসিন কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

মানুষের মস্তিষ্ক শুধুমাত্র একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখলেই শরীরের সামনের সারির প্রতিরক্ষা কোষগুলোর কার্যক্রম শুরু করে দেয়, যা অনেকটা প্রকৃত সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ার মতোই। গত ২৮ জুলাই, ২০২৫ *Nature Neuroscience* এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র এমনটাই।

এই গবেষণায় গবেষকেরা মস্তিষ্ক স্ক্যান, রক্ত পরীক্ষা এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হেডসেট ব্যবহার করেছেন। অংশগ্রহণকারীরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) হেডসেট পরে এমন অবতার দেখেছেন, যাদের ত্বকে ফুসকুড়ি ছিল আর যারা কাশি দিচ্ছিল, অর্থাৎ সেসকল অবতারদের অসুস্থতার লক্ষণ ছিল। তবে প্রকৃত কোনো রোগজীবাণুর সংস্পর্শে অংশগ্রহণকারীরা আসেননি।

গবেষণার এক গবেষক ও সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি হসপিটাল অব লসানের নিউরোসায়েন্টিস্ট আন্দ্রেয়া সেরিনো বলেন, "এই ফলাফল দেখায়, মস্তিষ্ক কতটা দ্রুত আগাম অনুমান করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া বেছে নিতে পারে।"

রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সাধারণত সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় কাজ শুরু করে, তবে সবসময় যথেষ্ট দ্রুত নয়। যদি মস্তিষ্ক

আগেভাগে সংক্রমণের আশঙ্কা বুঝে শরীরকে সতর্ক করতে পারে, তাহলে তা মারাত্মক অসুস্থতা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।

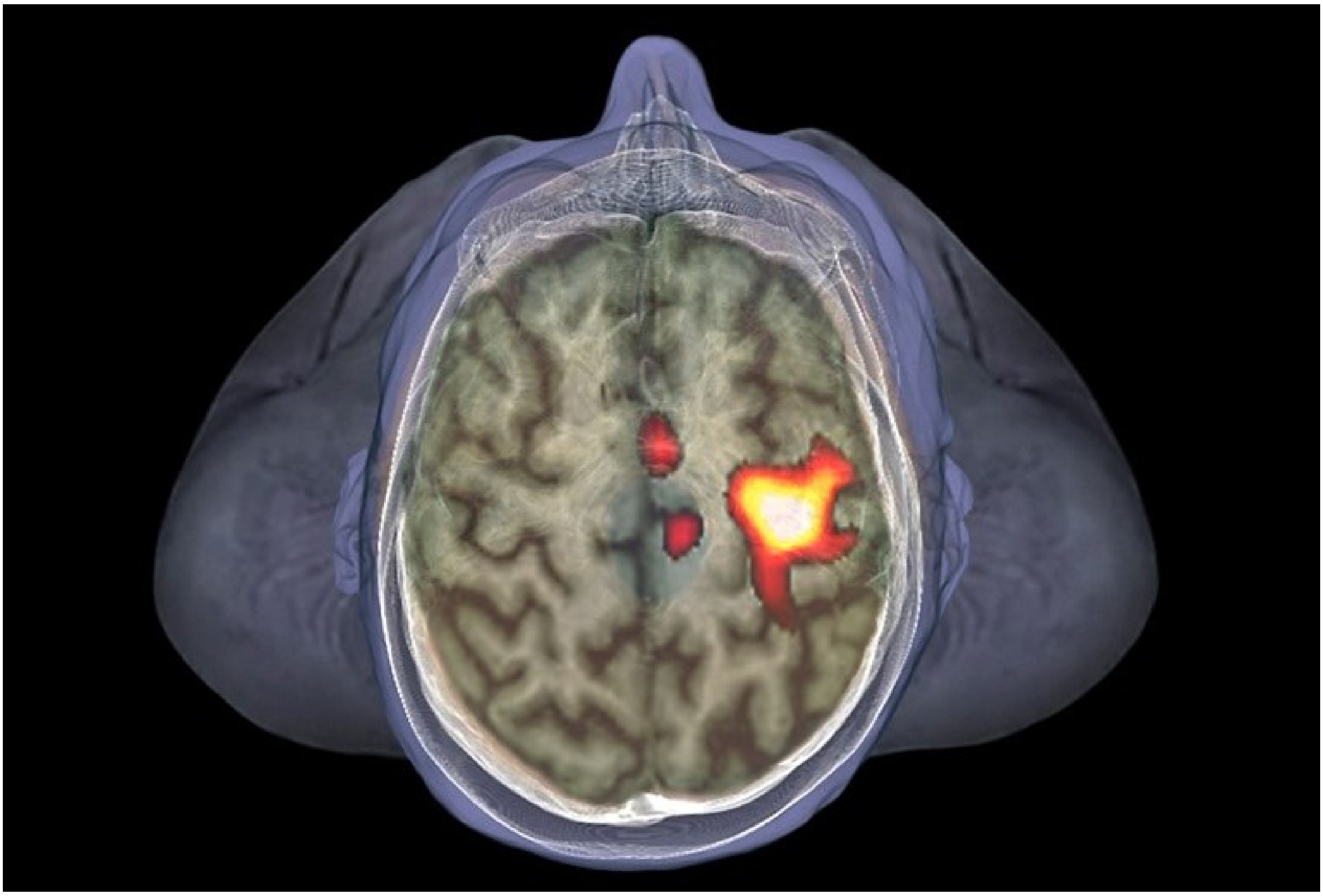

Zephyr/Science Photo Library

এই বিষয়টি পরীক্ষা করতে, সেরিনো ও তাঁর সহকর্মীরা স্বাস্থ্যবান স্বেচ্ছাসেবকদের মেটা-র Oculus Rift VR হেডসেট পরিয়ে এমন অবতার দেখান, যারা ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসে, যদিও কখনোই ছোঁয় না। কিছু অবতার অসুস্থতার লক্ষণ দেখায়, আবার কিছু সুস্থ দেখায়।

অন্য একটি দল অবতার দেখেনি, কিন্তু তারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃত জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে।

গবেষকেরা দেখেন, সংক্রামক অবতার যখন কাছে আসে, তখন মস্তিষ্কের 'পার্সোনাল স্পেস'-সংক্রান্ত অংশগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর সক্রিয় হয় salience network, অর্থাৎ সেই মস্তিষ্ক অঞ্চলের গুচ্ছ যা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বিশেষত হুমকিস্বরূপ ঘটনাকে চিহ্নিত করে এবং প্রতিক্রিয়া দেয়।

এই মস্তিষ্কীয় সক্রিয়তার ফলেই innate lymphoid cells নামে পরিচিত প্রাথমিক প্রতিরক্ষা কোষগুলোর পরিমাণ বাড়ে। যারা সংক্রামক অবতার দেখেছে, তাদের এই কোষের মাত্রা ছিল সুস্থ অবতার দেখাদের চেয়ে বেশি এবং এই মাত্রা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন পাওয়া দলের সঙ্গেও মিলে যায়।

গবেষণায় যুক্ত না থাকলেও, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ইমিউনোলজিস্ট আইজ্যাক চিউ বলেন, "এই গবেষণায় VR ব্যবহারের দিকটি বেশ আকর্ষণীয়।" তাঁর মতে, "দেহের দুটি জটিলতম ব্যবস্থা — মস্তিষ্ক ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা — পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে কীভাবে যৌথভাবে সাড়া দেয়, তা এই গবেষণায় অসাধারণভাবে ধরা পড়েছে।"

গবেষকেরা আশা করছেন, এই ধরনের মস্তিষ্কীয় প্রতিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ভ্যাকসিন আরও কার্যকর করা সম্ভব হবে। VR-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কোষ সক্রিয় করে তুললে,

ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া আরও জোরালো হতে পারে — যা ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাও বাড়াতে পারে।

লেখক: সাফিয়া তাবাসসুম রুমু

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41593-025-02008-y

পৃথিবী

প্রকৃতিতে বজ্রপাতের সূত্রপাত কীভাবে হয়?

নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, বায়ুতে 'ফটোইলেকট্রিক ফিডব্যাক' নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বজ্রপাতের সূচনা হয় এবং সৃষ্টি হয় উচ্চ-শক্তির গামা রশ্মি। এই আবিষ্কার বজ্রপাতের অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী শুরুকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

NASA/ALOFT team

আমরা সবাই জানি বজ্রপাত মানেই বিদ্যুৎ চমক, বিকট শব্দ আর কখনো কখনো প্রাণঘাতী ঘটনা। কিন্তু ঠিক কীভাবে এই বজ্রপাত শুরু হয়? এই প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের কৌতূহলের বিষয় ছিল। গত ২৮ জুলাই, ২০২৫ *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এই রহস্যভেদের বড়সড় অগ্রগতি দেখিয়েছেন।

পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির ভিক্টর পাসকোর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বজ্রপাতের সূচনা এবং 'Terrestrial Gamma Ray Flashes' (TGFs) নামে পরিচিত উচ্চ-শক্তির গামা রশ্মির উৎপত্তির পেছনে রয়েছে বায়ুতে ঘটে যাওয়া এক প্রকার 'ফটোইলেকট্রিক ফিডব্যাক'।

কী সেই 'ফটোইলেকট্রিক ফিডব্যাক'?

সাধারণভাবে, বজ্রপাত তখনই শুরু হয় যখন মেঘের মধ্যে বা মেঘ ও ভূমির মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব এতটাই বাড়ে যে তা বাতাসের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের এক প্রকার অ্যাভালাঞ্চ সৃষ্টি করে। এই ইলেকট্রনগুলো যখন বাতাসে থাকা নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সাথে সংঘর্ষ করে, তখন একধরনের উচ্চ-শক্তির এক্স-রে বা গামা রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মিগুলো আবার বিপরীত দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্য পরমাণুদের থেকে নতুন ইলেকট্রন ছিটকে বের করে আনতে সাহায্য করে আর এটাই হলো 'ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট'।

এই প্রক্রিয়ায় একের পর এক নতুন 'রানঅ্যাওয়ে ইলেকট্রন' সৃষ্টি হয়, যা খুব দ্রুত বজ্রপাতের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্রতিক্রিয়া এতটাই ক্ষুদ্র পরিসরে ঘটে যে তা প্রায় ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত শক্তিশালী বিকিরণ সৃষ্টির পরেও এর সাথে প্রায় কোনো আলো দেখা যায় না এবং তেমন রেডিও তরঙ্গও ধরা পড়ে না। এই কারণেই এগুলোকে বলা হয় "ডার্ক লাইটনিং"।

গবেষণার ফলাফল কী বলছে?

গবেষণাটিতে সময় নির্ভর সিমুলেশন করে দেখা হয়েছে, কীভাবে এই ফিডব্যাক মেকানিজম বজ্রপাত শুরুর জন্য যথেষ্ট শক্তি জোগায়। আরও দেখা গেছে, এই প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্নভাবে আচরণ করে, অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১ বা ২২ কিলোমিটার উচ্চতায় এদের কার্যকারিতা ও প্রকৃতি ভিন্ন হয়।

এছাড়া, গবেষকরা জানান এই ফটোইলেকট্রিক ফিডব্যাক প্রক্রিয়াই একসাথে ব্যাখ্যা করতে পারে বজ্রপাতের সূচনালগ্নের Initial Breakdown Pulses (IBPs), Narrow Bipolar Events (NBEs), Energetic In-cloud Pulses (EIPs), এবং TGFs-এর মতো ঘটনা।

বিশেষত, এই গবেষণা দেখায় কীভাবে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ফিডব্যাক লুপে জমে থাকা ইলেকট্রন হঠাৎ করে স্ট্রিমার গঠন করে, এবং সেটাই বজ্রপাতের সূচনা ঘটায়।

বজ্রপাত শুধু একটি দৃষ্টিনন্দন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি বিপজ্জনক এবং জটিল বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া। বজ্রপাতের সঠিক মেকানিজম জানা গেলে আগাম সতর্কতা জারি করা, মহাকাশ যান ও বিমানের নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং উচ্চ শক্তির গামা বিকিরণের উৎস বুঝতে সাহায্য মিলবে।

এই গবেষণা শুধু একটি দীর্ঘদিনের প্রশ্নের উত্তরই দেয়নি, বরং বজ্রপাত ও গামা রশ্মি সম্পর্কিত ভবিষ্যতের গবেষণার পথও প্রসারিত করেছে।

লেখক: সায়মা ইয়ানা

রেফারেন্স: DOI: 10.1029/2025JD043897

আপনার প্রতিক্রিয়া একান্ত কাম্য

info@bigganbarta.org

বিজ্ঞানবার্তা
bigganbarta.org